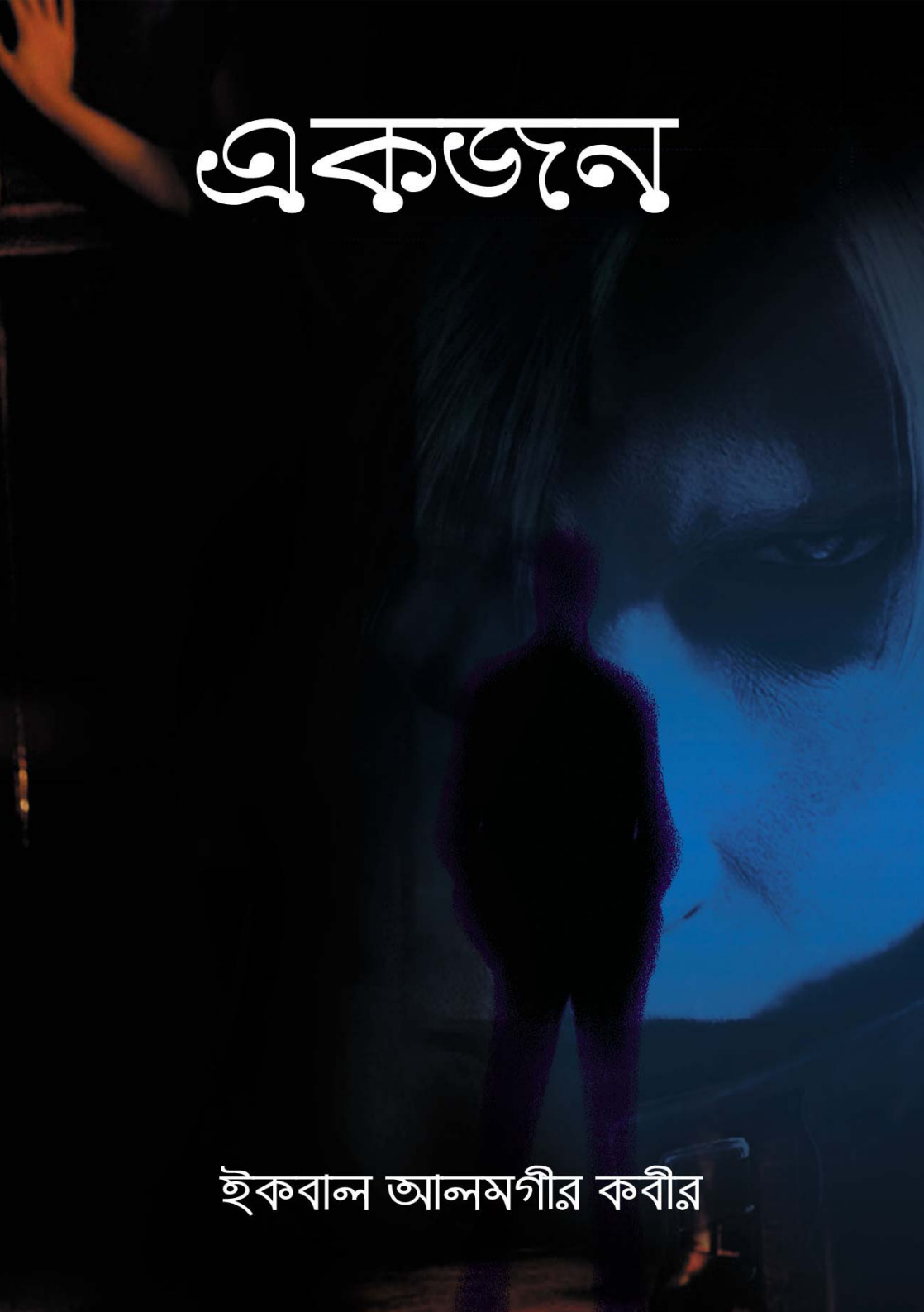

একজন
ইকবাল আলমগীর কবীর

একজন

(রহস্য উপন্যাস)

ইকবাল আলমগীর কবীর

যুবকটি যখন দোকানে ঢুকল তখন সেখানে ক্রেতা বেশী নেই। এইসময় ভীড় থাকার কথাও না। একেবারেই ভর দুপুর। লোকজন সবাই নিজের নিজের কাজের যায়গায় ব্যস্ত। দুপুরের খাবার সময় এখনো হয়নি। যাদের কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই তারাই এইসময় কেনাকাটা করতে আসে।

দোকানে ঢুকে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল যুবকটি। বিশাল দোকান। লম্বা লম্বা শোকেসের সারি। ভেতরের বিক্রেতাও এখন সংখ্যায় কম। ভীড় কম থাকায় নিজেদের কাজ সেরে নিচ্ছে। যেখানে পেমেন্ট দিতে হয় সেখানে কেউ নেই। একটু দুরে আরেকজনের সাথে নিচুস্বরে আলাপ করছে। দুয়েকজন বিক্রেতা যুবকের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। ইঙ্গিতে তাকে যেন বুঝিয়ে দিল, জিনিষ পছন্দ করলে তারা বিল করে দেবে, অথবা ডাকলে সাড়া দেবে।

সে সেলফের জিনিষপত্র দেখার দিকে মনোযোগ দিল। কয়েক পা সামনে হেঁটে এসে সেখানেই দাঁড়িয়ে সামনের সেলফের জিনিষ দেখল কিছুক্ষন। এখানে সাবান, টুথপেষ্ট, ওয়াশিং পাউডার, মাথায় দেয়ার তেল, স্যাম্পু এইসব রাখা। তারপরের সেলফে মিল্ক পাউডার, সয়াবিন তেল, শর্ষের তেল সাজানো। তারপরের সেলফে প্যাকেট করা চিনি, আটা, ময়দা, সেমাই। সেলফ দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। একেক সেলফে একেক ধরনের জিনিষ সাজানো। বেশি জিনিষ কিনলে ট্রলি ব্যবহার করতে পারে। ওর পাশেই একজন ট্রলিতে করে অনেক জিনিষপত্র নিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। মনেহয় বড় ধরনের ক্রেতা এই একজনই ছিল দোকানে।

হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে ভেতরের দিকে যেতে শুরু করল সে। জামাকাপড়, খেলনা, প্রসাধনী থেকে শুরু করে শাকসব্জি, চাল-ডাল, মাছ-মাংস সবকিছুই পাওয়া যায় এই দোকানে। বেশ কিছুটা দুরে একটা সেলফের দিকে ওর দৃষ্টি থামল। সুন্দর সুন্দর ছোটবড় প্যাকেট সাজানো সেখানে। দুর থেকেই দুএকটা নাম পড়তে পারল সে। সেদিকে পা বাড়াল।

ওখানেই পাওয়া যাবে তার জিনিষ। অন্য যায়গায় ক্রেতা না থাকলেও এখানে রয়েছে দুজন। একজন মহিলা, সঙ্গে ছোট একটা মেয়ে। ওরা সেন্টের প্যাকেট দেখছে। কাঁচের ওপর অনেকগুলো সেন্টের প্যাকেট নামানো। মহিলা একটা সেন্টের প্যাকেট হাতে নিয়ে দেখছে মনোযোগ দিয়ে। সেদিকে একবার তাকাল সে। তারপর সেলফের দিকে ফিরল। ডেস্কের ভিতর দিকে সেলসম্যান জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে।

‘জেসমিন দেখান তো।’ সেলসম্যানকে বলল সে।

তার সামনেই কাঁচের ওপর বেশ কয়েক ধরনের সেন্ট নামানো রয়েছে। সেলসম্যান আরো কয়েকটি নামাল। পরে নামানো সবগুলিই জেসমিন। সে একটা একটা করে হাতে উঠিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। সেন্ট সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না সে। জেসমিন নামে সেন্ট পাওয়া যায় এটুকুই তার জ্ঞান। বিক্রেতা তার সামনে একই নামের কয়েক রকম প্যাকেট নামিয়ে রাখায় অবাক হয়েছে সে। উল্টেপাল্টে লেখা দেখে ধারনা পাওয়ার চেষ্টা করছে আসলে বিষয় কি। এরমধ্যে কি আসল নকলের বিষয় রয়েছে?

নাকি বিভিন্ন দেশের তৈরী? নাকি অন্যকিছু? লেখা দেখে, প্যাকেটের চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

হঠাৎ করেই পেছন দিক থেকে কেউ টানল যুবককে। চমকে পিছনে তাকাল সে।

ছোট্ট মেয়েটা তার সার্ট ধরে টেনেছে।

মেয়েটার মা ব্যস্ত ছিল নিজের কাজে। তাকে ফিরে তাকাতে দেখে ঘুরল। দুষ্টুমিভরা চোখে চেয়ে আছে ছোট মেয়েটা। যুবকের দিকে চেয়ে হাঁসছে। বুঝতে সময় লাগল না কি ঘটেছে।

মেয়েটার মা মেয়ের হাত ধরে টানল নিজের দিকে। মুখে বিরক্তি। ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। ঘুরে যুবকটির দিকে তাকাল। যুবকটি হাঁসিমুখে তাকিয়ে আছে তারদিকে।

'সরি।' বলল মেয়েটির মা।

'ঠিক আছে।' হেঁসে বলল যুবক। ঘুরে ছোট মেয়েটার দিকে তাকাল। বোধহয় এখনো পাঁচে পড়েনি। চোখ কুঁচকে হাসিহাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওকে তাকাতে দেখে হঠাৎ করে হেঁসে ফেলল শব্দ করে। বেশ কিছুক্ষন হাঁসল একাএকাই। তারপর হঠাৎ করেই হাঁসি থামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে জিভ বের করল।

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। মেয়েটার মা হতভম্ভ। বুঝতে পারছে না কি করবে। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মেয়েকে। তবে বাধা দিচ্ছে না।

মেয়েটা এখন হাসছে দাঁত বের করে। সামনের দুটো দাঁত নেই। বোঝা যাচ্ছে বেশ আলাপি। অপরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সংকোচ নেই। হয়ত বাড়িতে এই যুবকের বয়সী কেউ রয়েছে যারসাথে সবসময় এধরনের ঘটনা ঘটায়। এমনিতেই এই বয়সে কথা তোতলানো হয়, দাঁত না থাকায় এর তোতলামি আরো বেশী।

'কি দেখাতে বলেছেন?' এবার জিজ্ঞেস করল সে হাঁসতে হাঁসতে।

প্রশ্নটা তাকেই করেছে, অবাক হল যুবক। সে দোকানদারকে কি বলেছে জানতে চাইছে বুঝতে একটু সময় লাগল তার। বুঝতে পেরে হেঁসে ফেলল সেও। হাসিহাসি মুখে বলল, 'বলেছি জেসমিন। একটা সেন্ট। জেসমিন মানে বেলি ফুল। বেলি ফুলের গন্ধ।'

'আমিই তো বেলি ফুল।'

হি-হি করে হাঁসছে এখন মেয়েটা। খুব যেন মজার কথা বলেছে সে। শব্দ করে অনবরত হেঁসেই যাচ্ছে। যুবক ঘুরে দেখল ওর মাকে। তার চোখেও কৌতুক। তার কাছেও এটা মজার কিছু।

'তাই নাকি? দেখি।'

এগিয়ে এসে দুহাতে ওকে উচু করে ধরল সে। গালের সাথে নাক লাগিয়ে শুঁকল। যেন ফুলের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করল তার গাল থেকে।

'কোথায় বেলিফুল?' প্রশ্ন করল সে।

মুচকি হাঁসি লেগে আছে ওর মায়ের ঠোটে। এবারে সে ব্যাখ্যা দিল, 'ওর নাম জেসমিন।'

‘ও তাই তো! ’ অবাক হয়ে যুবকটি আবার শুঁকল তার গাল, ‘হুঁ, এখন একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। খুব সুন্দর।’

মেয়েটাকে আস্তে করে মেঝেয় নামিয়ে দিল যুবক। দুপা সরে মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। শাড়ি আঁকড়ে ধরে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। এখনো তার মুখ থেকে হাসি যায়নি।

’তুমি কি নেবে?’ হাসিমুখে তাকে জিজ্ঞেস করল যুবক।

একমুহূর্ত ভাবল মেয়েটা। কি নেবে মনে করতে পারল না। তারপর ঘুরে দোকানের চারিদিকে তাকাল। কি নেবে ঠিক করছে। চারিদিকে জিনিষপত্র দেখে মনে করার করার চেষ্টা করছে কি নেয়া যায়।

বিক্রেতার দিকে ঘুরল যুবক। শোকেসের ওপর রাখা নীল রঙের একটা সেন্টের প্যাকেট বিক্রেতার দিকে ঠেলে দিল। এই প্যাকেটটার সাথেই সে পরিচিত, এটাই নেবে সে।

বিক্রেতা নিচু হয়ে ভেতর থেকে নক্সাকরা কাগজের প্যাকেট বের করল। জেসমিনের প্যাকেটটা ঢুকাল তারমধ্যে। যুবকের সামনে শোকেসের কাঁচের ওপর রাখল। আড়চোখে একবার ছোট মেয়েটার দিকে দেখল যুবক। এখনও জানায়নি কি নেবে সে। বাইরের দিকে মুখ করে রয়েছে।

‘কংকাল।’ হঠাৎ করেই উত্তর দিল মেয়েটা।

চমকে উঠল যুবক। কংকাল নিতে চায়?

‘কংকাল !’

নিজের অজানে-ই কথাটা বের হল তার মুখ দিয়ে। চোখে বিস্ময় নিয়ে ঘুরে ওর মায়ের দিকে তাকাল সে। দেখল সেই মুখে হাঁসি নেই। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দরজার দিকে। ঝট করে সেদিকে চোখ ফেরাল যুবক।

চারজন লোক দোকানে এসে ঢুকেছে। দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। চারজনেরই মাথায় কালো মুখোস। মুখোসে কংকাল আঁকা। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল।

কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না কেউ। চারজনের একজন দ্রুত চলে এল ওদের দিকে। একজন সোজা ভেতরের দিকে কাউন্টারের কাছে ঢুকে পিস্তল উচু করে ধরল। বাকি দুজন পিস্তল ধরে দাঁড়াল দরজার কাছেই। দুজন দুদিকে মুখ করে। পুরো দোকান কাভার করে।

‘খবরদার কেউ নড়বে না। খুলি উড়িয়ে দেব।’ চিৎকার করল ভেতরে ঢোকা লোকটা। দুইহাতের মুঠোয় পিস্তল ধরে দোকানের চারিদিক ঘুরাল।

দোকানের কর্মচারীরা মুর্তির মত থেমে গেছে নিজের নিজের যায়গায়। অঙ্গভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না এদের। আর কিছু বলা প্রয়োজন নেই।

ওদের দিকে আসা লোকটা এগিয়ে এসে ছোট মেয়েটার হাত চেপে ধরল। ‘আ-’ করে চিৎকার করে উঠল সে। হাত টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। লোকটা তার বাহুর কাছে শক্ত করে ধরে তার মায়ের দিকে পিস্তল তাক করল একবার। তার মা হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। লোকটা ছোট মেয়েটার হাত ধরে এক পা পিছনে সরল। তারপর ঘুরে রওনা দিল বাইরের দিকে।

চোখের সামনে থেকে পিস্তল সরাতেই তার মা এগিয়ে গেল সামনে। লোকটা বুঝতে পেরেই ঘুরে দাঁড়াল। পিস্তলধরা হাত দিয়ে তার মুখের ওপর ঘুসি মারল। পিস্তলের নিচের অংশ আঘাত করল তার মুখে। ঘুরে কাঁচের শোকেসের সাথে ধাক্কা খেল সে। তার দিকে পিস্তল উচু করে ধরল লোকটা। মেয়েটার মা কাঁচের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। একমুহূর্ত থেমে চারিদিকে একবার দেখল সে। কেউ সামনে আসছে না দেখে আবার রওনা দিল বাইরের দিকে। মেয়েটাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গিরা পিস্তল উঁচিয়ে আছে। দোকানের একজনও নড়ছে না। কেউ বাধা দিচ্ছে না।

অপহরন।

এই ছোট মেয়েটাকে নিতেই এসেছে ওরা। দোকানের অন্য কোন দিকে নজর দেয়নি। টাকাপয়সার খোঁজ করেনি। অন্য কে কোথায় আছে দেখাও প্রয়োজন মনে করেনি। শুধু মেয়েটাকেই নিয়ে যাচ্ছে। তার হাত ধরে কয়েক পা চলে গেছে লোকটা।

লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে হতভম্ভ যুবক।

হঠাৎই মেয়ের মাকে যুবকের সামনে দেখা গেল। এখন তার হাতে লম্বা কিছু। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুটে গিয়ে এগিয়ে যাওয়া লোকটার মাথায় বাড়ি মারল সেটা দিয়ে। মাথায় বাড়ি খেয়ে হাঁটুভেঙে পড়ে গেল লোকটা মেঝেতে। হাতের পিস্তল ছুটে গেছে। আরেকহাতে ধরা ছোট মেয়েটাও ছুটে গেছে। লোকটা দুহাতে মাথা চেপে ধরেছে।

তক্ষুনি গুলির শব্দ।

সাথেসাথে মেয়েটার মা বসে পড়ল মেঝেতে। গুলি লেগেছে তার শরীরে। কোথায় লেগেছে বোঝা যাচ্ছে না। মেঝেতে বসে বামহাত ভাঁজ করল। একটুপরই সেখান থেকে রক্ত গড়াতে দেখা গেল। সাদা মেঝের ওপর টপটপ করে পরছে টকটকে লাল রক্ত। অবাক হয়ে নিজের রক্ত দেখছে মেয়েটার মা।

আঘাত পাওয়া লোকটা সামলে নিয়েছে। ওঠার চেষ্টা করছে। ছোট মেয়েটা যেন চিৎকার করতেও ভুলে গেছে। লোকটার হাত ছুটে গেছে তার হাত থেকে। সে ছাড়া পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। লোকটার কাছ থেকে দুরে সরে যেতে চেষ্টা করছে। পিস্তলটা পরে আছে ওদের সামনে। কয়েক হাত দুরে।

তখনই লাফ দিল যুবক। লোকটার ওপর দিয়ে যেন উড়ে গেল ওপাশে। মেঝেতে ডানকাঁধ ঠেকিয়ে ডিগবাজি খেয়ে যখন উঠে দাঁড়াল ততক্ষনে তার হাতে পড়ে থাকা পিস্তলটা উঠে এসেছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি বের হল সেখান থেকে। দ্রুত দুটি গুলির শব্দ শোনা গেল।

ভিতরে দাঁড়ানো লোকটা পিস্তল ঘুরাচ্ছে। আবার লাফ দিল সে। আরেকটা গুলি বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে।

সামনের নিচু শোকেসের কোনায় পা ঠেকল যুবকের। ডাইভিং বোর্ডের মত সেখানে ধাক্কা মেরে আবার শুন্যে ভাসল তার শরীর। শুন্যে থাকতেই ঘুরতে ঘুরতে দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে চতুর্থজন। আরো একটা গুলি।

তখনই কিসের সাথে যেন ধাক্কা লাগল যুবকের মাথায়। পিস্তল খসে গেল হাত থেকে। মেঝেয় পরার আগেই জ্ঞান হারাল সে। হুড়মুড় করে সেলফের জিনিষপত্র পরতে থাকল ওর শরীরের ওপর।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। যেন প্রচন্ড ঝড়ের অন্ধকার রাতে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলতে পারছে না সে। দেখতে পাচ্ছে না কিছু, শুধু শুনছে ঝড়ের শব্দ। চারিদিকের সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝড়। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি-গাছপালা। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে সবকিছু। ও বাইরে বের হলে দেখবে চারিদিকে যতদুর চোখ যায় সবকিছু সমান হয়ে গেছে। ঘরবাড়ি গাছপালা কোনকিছু নেই। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে কোথায় যেন। সামনে একেবারে ফাঁকা যায়গা, শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে। একমাত্র মাটির ঘাসগুলোকেই যেন উড়িতে নিতে পারেনি। সেগুলো দুলছে হাওয়ায়। ঝড়ের প্রচন্ডতা বুঝানোর জন্য ছোট একটা গাছ থেকে গেছে একা। উল্টানো ছাতার মত তার সমস্ত ডালপালা ঝুঁকে গেছে একদিকে।
অথচ এখানে, তার শরীরে এতটুকু হাওয়ার ঝাপটা লাগছে না। শুধু শব্দ দিয়েই সে অনুভব করছে ঝড়। চোখ না খুলেই দেখতে পাচ্ছে তান্ডব। প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে কে যেন চিৎকার করছে। ও চেষ্টা করল কথা শোনার। কে যেন কাকে ডাকছে। ঝড়ের মধ্যে থেমে থেমে ভেসে আসছে সেই শব্দ। কে যেন বলছে 'শুনতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন।'

ও প্রানপনে চোখ খুলতে চেষ্টা করল। পারল না। কে যেন জোর করে বন্ধ করে রেখেছে চোখের পাতা।

একেবারে কানের কাছে কে যেন বলল, 'শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? হাতের আঙুল নাড়ান তো। ডানহাতের আঙুল নাড়ান।'
কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল ও। ওর কানের কাছে মুখ এনে কথা বলছে কে যেন। ওকে আঙুল নাড়াতে বলছে। প্রানপন চেষ্টা করল সে আঙুল নাড়াতে। নড়ল কিনা জানে না সে।

ঝড় চলতেই থাকল। আবার ঘুমিয়ে পরল সে।
আবার জেগে উঠে সে বুঝতে পারল না এটা স্বপ্ন না বাস্তব। চোখ খুলতে পারছে না। চোখ না খুলেই বুঝতে পারল বিছানায় শুয়ে আছে ও। মাথা ভারী হয়ে আছে। চেষ্টা করেও নড়াতে পারল না এতটুকু। মনে হচ্ছে আটকানো আছে কিছুর সাথে। হাত নাড়াতে চেষ্টা করল। কে যেন আঙুল নাড়াতে বলেছিল তাকে, মনে পড়ছে তার। আঙুল নাড়ানো যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে সে তার আঙুল নাড়াতে পারছে। দুহাতই নড়াতে পারছে সে। বামহাতের আঙুল ভাঁজ করতেই কনুইয়ের কাছে ব্যথা করছে। টান লাগছে পেশিতে। বুকের কাছে ব্যথা করছে।

কি হয়েছে ওর?

চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করল ও। ভারী হয়ে আছে চোখের পাতা। চেষ্টা করে আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলল একসময়। ওর সামনে আবছা অন্ধকার। সামনে সাদা

কুয়াশা। সবকিছু ঢেকে আছে সেই কুয়াশায়। চেয়ে থাকতে থাকতে দেখল ধীরে ধীরে সেই কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। ও দেখতে পাচ্ছে। ওর চোখের সামনে সাদা আকাশ। না, আকাশ না, সাদাটে রঙের দেয়াল। পরিস্কার দেয়ালের কিছু অংশ আর ছাদ দেখতে পাচ্ছে সে। ছোট একটা ঘর। ও বিছানায় শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। কোনদিকে ঘাড় ঘুরাতে পারছে না। কোন শব্দ নেই কোথাও। কেউ নেই ঘরে।

কে যেন ঢুকল ঘরে। এগিয়ে এল ওর বিছানার কাছে কোন শব্দ না করে। ও শুধু অনুভব করল কারো উপস্থিতি। বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই আছে চুপ করে। অপলক চেয়ে থাকল সে সামনের দেয়ালের দিকে।

একটু পরই কথা শুনতে পেল ও, 'ঘুম ভেঙেছে?'

ও দেখল ওর সামনে এগিয়ে এসেছে একটা মুখ। একটা মেয়ে। পাতলা গড়নের মুখ। লম্বাটে ডিমের মত। আস্তে করে চোখ ঘুরাল সে তাকে দেখার জন্য। মেয়েটার পড়নে সাদা পোষাক। মাথায় নীল বর্ডার দেয়া বাঁকানো টুপি। টুপির নিচ দিয়ে কপালের ওপর চুল এসে বাঁকা হয়ে গেছে। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাঁসল। দাঁতের ওপর আলো পরে চকচক করছে। একটু পর হাত বাড়িয়ে ওর কপালে আঙুল ছোঁয়াল মেয়েটা। জ্বর দেখছে বোধহয়।

ও অসুস'। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বুঝতে পারছে একটু একটু করে।
এতটুকু হাতপা নড়াতে পারছে না সে।

'ওঠার চেষ্টা করবেন না। শুয়ে থাকুন।'
চোখ বন্ধ করল সে। একটুপর আরেকজনের কণ্ঠ শুনতে পেল। পুরুষ কণ্ঠ। তারপর মনে হল ওর খাটটা নড়ছে। আবার ঘুমালো না জ্ঞান হারালো জানে না সে।

আবার একসময় জেগে উঠল সে। এবারে শরীরটা চাঙা মনে হচ্ছে। নিজের অস্তিত্ব বুঝতে পারছে সে। বুঝতে পারছে সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে ছোট একটা ঘরে। হাত-পা নাড়াতে পারছে। চেষ্টা করে মাথাও নাড়াতে পারছে। প্রচন্ড ভারী মনে হচ্ছে মাথাটা। মনে হচ্ছে ভারী ওজন চাপিয়ে রাখা হয়েছে মাথায়।

চোখ খুলে ছাদের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল সে। ডানহাত কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে উচু করল। হাতের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল। সে দেখতে পাচ্ছে তার হাত। হাতের রেখা দেখা যাচ্ছে। হাতটা বুকের ওপর নামাল সে। বামহাতে ব্যথা। বুকের কাছেও ব্যথা। আস্তে করে হাত নামিয়ে রাখল বিছানায়। তখনই অনুভব করল কেউ এসে দাঁড়াল বিছানার কাছে।

আস্তে করে মাথা ঘুরাল সে। সেই সাদা পোষাকপরা নার্স। ও তাকাতেই হাঁসল।

'আর কোন ভয় নেই। উঠতে পারবেন? দেখুনতো চেষ্টা করে। আমি ধরছি।' তাকে বলল নার্স।

ভালভাবে তাকাল সে। পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। চেষ্টা করে মাথা নাড়াতে পারছে। আস্তে করে ঘাড় নাড়াল সে। ব্যথা করলেও ঘাড় ঘুরানো যাচ্ছে। হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। নার্স এগিয়ে এসে তাকে ধরল। নার্সের হাত ঠান্ডা। নাকি তার শরীর গরম? নিশ্চয়ই জ্বর রয়েছে এখনো।

তাকে ধরে একটু উঠিয়ে বালিস ঠেস দিল পিঠের কাছে। বসে আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরাল সে। পুরো ঘর দেখতে পেল এখন।

ছোট্ট একটা ঘর। ওর বামদিকের দেয়ালে সাদা রঙের মোটা পর্দা ঢাকা জানালা। বিপরীতদিকে বাইরে যাবার দরজা। সেটার সামনেও ভারি পর্দা ঝুলছে। আরেক দরজা সম্ভবত বাথরুমের। ওর সামনের দিকে শুধুই দেয়াল। দিন না রাত বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে নীলচে-সাদা আলো জ্বলছে। ওর সামনের দিকে একটা লম্বাটে আলো জ্বলছে সেডের আড়ালে, সম্ভবত পিছনের দিকে আরো একটা।

দরজার ডানপাশে একটু দুরে একটা ছোট টেবিল। একটা হাতলছাড়া কালো রঙের প্লাষ্টিকের চেয়ার। ঘরে আরকিছু নেই।

মেয়েটা এগিয়ে এসে ওর চুলে হাত দিল। ব্যথা করছে মাথায়। চুল সরিয়ে কিছু দেখছে। মাথায় ব্যান্ডেজ নেই। থাকলে ওভাবে চুল সরিয়ে দেখতে পেত না। সামান্য চুল সরালেই ব্যথা পাচ্ছে ও। টান লাগছে চুলে। চুল সরিয়ে আঙুল বোলাল মাথায়। মনে হচ্ছে ফুলে আছে। একসময় দেখা শেষ করে হাত সরাল মেয়েটা।

'খারাপ লাগলে শুয়ে পড়বেন।' বলল তাকে।

কোন উত্তর দিল না সে। মেয়েটা অপেক্ষা করছে। সামনে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছে তাকে। তারপরই ঘুরল। সরে গেল বিছানার কাছ থেকে। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল। একটু পরই ফিরল হাতে সাদা রঙের বড় একটা মগ নিয়ে। লাল রঙের কি যেন আঁকা মগের গায়ে। মগ হাতে এগিয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়াল।

'একটু কষ্ট করে খেয়ে নিন। ভাল লাগবে।'

মগটা ওর মুখের সামনে ধরেছে। মগের সামনের অংশ চামচের মত বাঁকানো। ঠোটের ফাঁকে সেটা ঢুকিয়ে কাত করেছে। মুখের পাশ দিয়ে তরল গরম কিছু গড়িয়ে পরল। ও মুখ খুলে খাওয়ার চেষ্টা করল। ব্যথা পাচ্ছে ঢোক গিলতে। গলা শুকিয়ে গেছে। ও মুখ সরাতে চেষ্টা করল।

মেয়েটা মগ সরাল একটু। তারপর আবার ধরল মুখের কাছে।

খেতে চেষ্টা করল ও। বিস্বাদ লাগছে। চেষ্টা করে কয়েক ঢোক খেয়ে ফেলল। গলায় গরম তরল যাওয়ায় ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে ওষুধ মেশানো আছে। কোনরকম স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু ওষুধ ওষুধ গন্ধ। কষ্ট করে মগের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল। তারপর মুখ সরাল। এরপর আর জোর করল না মেয়েটা। ঘুরে সামনে গিয়ে মগটা টেবিলে রেখে দিল। এগিয়ে এল ওর কাছে।

'এবার শুয়ে পরুন।'

আবার ধরে শুইয়ে দিল ওকে। গরম লাগছে ওর। রীতিমত ঘেমে গেছে। চিত হয়ে শুয়ে দেখতে পেল মাথার ওপর সাদা ফ্যানটা ঘুরতে শুরু করল। প্রথমে খুব জোরে। তারপরই বোধহয় মেয়েটা স্পিড কমাল। আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকল ওটা ওর মাথার ওপর। চিত হয়ে শুয়ে সোজা সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে।

মেয়েটা এসে দাঁড়াল বিছানার পাশে। কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে।

একটুপর কথা শুনতে পেল সে, 'ঘুমের ওষুধ খেয়েছেন। ঘুমান। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। বেশি কিছু হয়নি আপনার। মাথায় ব্যথা লেগেছে, দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।'

চোখ বন্ধ করল ও। ঘুমিয়ে পরল একটু পরই।

কিসের যেন শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল বামদিকের জানালার পর্দা সামান্য সরানো। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। তারমানে দিন। মনেহয় দুপুর, কিংবা বিকেল। টেবিলের কাছে ওরদিকে পিছন ফিরে কি যেন করছে একজন। সাদা পোষাক পরা নার্স। একটু পরই ঘুরল তারদিকে। এখন সোজা তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। আগে রোগাপাতলা মনে হয়েছিল এখন তা মনে হচ্ছে না।

না-কি এ আরেকজন? মনে হয় তাই। এর মুখ গোল। বয়সও অন্যজনের চেয়ে একটু বেশী মনে হচ্ছে। ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সোজা চেয়ে আছে। এপ্রনের পকেটে হাত ঢুকাল। কি যেন ভাবছে। একটু পরই এগিয়ে এল ওর কাছে। বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

ওর দিকে তাকিয়ে ডান হাত ঝাঁকাচ্ছে। হাতে থার্মোমিটার। আরেকটু এগিয়ে এসে ওর মুখের মধ্যে থার্মোমিটারটা ঢুকিয়ে দিল। ও শুনতে পেল তার কথা, 'এটা মুখে রাখুন।'

অন্য নার্স থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখেনি। কপালে হাত দিয়ে দেখেছে। অথবা দেখেছে ওর মনে নেই। এই নার্সকে আগের নার্সের মত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অনেক অভিজ্ঞ, অনেক ভারিক্কি স্বভাবের। এতটুকু হাঁসি নেই মুখে। তার মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিয়ে বামহাতের ঘড়ির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। হাতের আঙুল এতটুকু কাঁপছে না। মনেহচ্ছে মোমের তৈরী একটা মুর্তি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

একসময় নড়ে উঠল সেই মুর্তি। ওর মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর আবার পকেটে রাখল।

'এখনও ভাল জ্বর আছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।'

'ভাল লাগছে না।'

এই প্রথম কথা বলল সে।

নিজেই অবাক হল গলার স্বর শুনে। মনেহচ্ছে অপরিচিত কেউ যেন কথা বলল ওর ভেতর থেকে। একটু সময় নিয়ে গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল সে। এখনো গলা শুকিয়ে আছে। পানি খাওয়া দরকার।

নার্স কথা বলেই যাওয়ার জন্য ঘুরেছিল, ওর কথা শুনে থেমেছে। থেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তারদিকে। তার কথার অর্থ ধরতে পারেনি বোধহয়।

'শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।' আবার বলল সে। এবারে তার কথা অনেক পরিস্কার।

নার্স একটু সময় নিল উত্তর দিতে। একেবারে শান্ত গলায় বলল, 'ভাল না লাগলেও শুয়ে থাকতে হবে। এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। কমপ্লিট রেষ্টে থাকতে হবে কয়েকদিন। ওঠা চলবে না, কথা বলা চলবে না, চিন্তা করাও চলবে না। চুপ করে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন।'

'আমার কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস না করে পারল না সে।

'মাথায় লেগেছে। আর কোন কথা বলবেন না।'

'ফেটে গেছে?'

'না, ফুলে আছে। আর কোন কথা না।'

'আরেকজন কোথায়?'

হতাসভাবে শ্বাস ফেলল নার্স। তার কথা শুনছে না রোগী। সে এমন মুখভঙ্গি করল যেন আরেকবার প্রশ্ন করলে ধমক দেবে। রাগতভাবে উল্টো প্রশ্ন করল, 'আরেকজন কে?'

'আরেকজন নার্স। এখানে ছিল।'

'রেবেকা। ওর ডিউটি সন্ধ্যায়। ও সাধারন নার্স না, থার্ডইয়ার পর্যন্ত মেডিকেলে পড়েছে। আর একটাও কথা না।'

যেন কথা এড়াতেই ঘুরে দরজার দিকে সরে গেল নার্স। সেখানে থেমে ওরদিকে একবার তাকাল, তারপর ঘরের বাইরে চলে গেল।

রেবেকা ওর নাম, মনেমনে আওড়াল সে। থার্ডইয়ার পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে পড়ে নার্স হয়েছে। কেন?

একটুপরই আবার ঘরে ঢুকল নার্স। এপ্রনের সামনের দিকে দুই পকেটে দুই হাত ঢোকানো। আস্তে আস্তে হেঁটে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। সে জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তারদিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষন। তারপর বলল, 'আপনার ঠিকানাটা বলবেন? খবর দিলে বাড়ির লোকজন আসত।'

ঠিকানা?

মাথাটা ঘুরে উঠল ওর।

ওর ঠিকানা কি? ওর বাড়ি কোথায়? কে আসবে বাড়ি থেকে?

আশ্চর্য্য। কিছুই মনে পরছে না। মনে করতে চেষ্টা করলেই ঘন কুয়াশা দেখতে পাচ্ছে সে। নাকি সমুদ্রের ঢেউ। কোন শেষ নেই তার। কিছু একটা যেন রয়েছে তার ওপাশে। সে বুঝতে পারছে আছে, দেখতে পাচ্ছে না। দেখার চেষ্টা করলেই মাথায় ব্যথা করছে। বড়

বড় ঢেউ আছড়ে পরতে শুরু করেছে ওর চোখের সামনে। গরম লাগতে শুরু করল ওর। চোখের সামনে দাঁড়ানো নার্সকেও যেন দেখতে পাচ্ছে না সে। মনে হচ্ছে ধোঁয়ার তৈরী একটা মুর্তি ওর সামনে।

নার্স অপেক্ষা করছে উত্তরের।

কিছুই মনে পড়ছে না তার। একসময় হাল ছেড়ে দিল সে।

'মনে করতে পারছি না।' উত্তর দিল সে।

'আপনার নাম?'

'মনে পরছে না।' ছাদের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলল সে।

নার্স তাকিয়ে থাকল তার দিকে। কি বুঝল বোঝা গেল না, কয়েক মুহুর্ত এতটুকু নড়ল না। তারপর যখন মুখ খুলল মনে হল মেনে নিয়েছে তার কথা। আগের মতই স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে। এখন চোখ বন্ধ করে ঘুমান। নয়ত ঘুমের ওষুধ দেব।'

নিজের করনীয় জানিয়ে দিল নার্স। যুবকের মনে হল তার গলা একেবারে ভাবলেশহীন। রুষ্ঠতা নেই তাতে, তেমনি কোন আন্তরিকতাও নেই। একেবারে যান্ত্রিক। আগের নার্স থেকে একেবারেই আলাদা। আগের নার্স হেঁসে হেঁসে কথা বলেছে।

চোখ বন্ধ করল ও। একট ুপর ঘুমিয়ে গেল আবার।

আবার যখন ও জেগে উঠল দেখল ঘরে কেউ নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। একেবারে নিশ্চুপ চারিদিক। ওর চারিদিকে সবকিছু যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। কারো কথা, কোন রকম শব্দ এসে পৌছাচ্ছে না ওর কানে।

দিন না রাত এখন? জানালার দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল। মনে হয় সকাল। পর্দার ভেতর দিয়ে আলো ঢুকছে। বোঝা যাচ্ছে বাইরে সামান্য হলেও আলো রয়েছে। এখনো দিনের আলো পুরো ফোটেনি। ঘরের মধ্যে অল্প পাওয়ারের নীলচে আলোটা এখনো জ্বলছে। মনেহয় সবসময় জ্বালানোই থাকে ওটা।

শুয়ে থেকে মনে করতে চেষ্টা করল সে সবকিছু। সে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। মাথায় আঘাত পেয়েছে। এখন ব্যথা পাচ্ছে না মোটেই। বোধহয় ওষুধের গুনে। শরীরের কোথাও উল্লেখ করার মত ব্যথা নেই। একেবারে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে সবকিছু। অনেকক্ষন ঘুমিয়েছে। হয়ত কয়েকদিন। এটাও বোধহয় ওষুধ দিয়ে করা হয়েছে। চোখ বন্ধ করলেই ঘুমঘুম ভাব চলে আসছে।

তার নাম জিজ্ঞেস করেছিল নার্স। সে বলতে পারেনি। মনে করতে পারেনি তার নাম।

কেন?

মারাত্মক কিছু হয়েছে কোথাও। ও ভুলে গেছে ওর নাম। ওর ঠিকানা। ওর পরিচয়। সবকিছু। মাথায় বড় ধরনের আঘাত পেলে এমন হয় জানে সে। কোনভাবে জেনেছে। শুনেছে

কারো কাছে, কিংবা কোথাও পড়েছে। সেটা মনে করতে পারছে সে অথচ নিজের নাম মনে করতে পারছে না। ওকে কি নামে ডাকত অন্যরা মনে করতে পারছে না। আশ্চর্য্য। তার যেন কোন নাম নেই।

সোজা ছাদের ফ্যানের দিকে তাকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল সে। আস্তে আস্তে অনবরত ঘুরে চলেছে সেটা।

বাইরে বারান্দা থেকে শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন হেঁটে গেল খটখট শব্দ করে। হয়ত কোন ডাক্তার। হাল্কা পায়ের শব্দ। মনেহয় মহিলা ডাক্তার। অথবা নার্স।

আবার নিশ্চুপ চারিদিক।

কেউ নিশ্চয়ই আসবে এখানে। সেই নার্স, রেবেকা যার নাম। কিংবা আরেকজন। এর নাম কি জানে না সে।

তার কিছুই করনীয় নেই। সোজা ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সে।

বাইরে একজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, 'অঞ্জন, উদিকে যাসনে।'

অঞ্জন। কারো নাম। সুন্দর নাম।

ঘুরে দরজার দিকে তাকাল সে। দরজা ভেজানো। পর্দার নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে পাল্লাদুটো। ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে সেদিক দিয়ে।

চেষ্টা করে বিছানায় উঠে বসল সে। বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল। হাঁটু ভাঁজ করে খাটের সাথে হেলান দিয়ে বসে দুহাত কোলের ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল সেভাবেই। কতক্ষন কাটাল মনে নেই তার, একসময় কারো হাল্কা পায়ে হাঁটার শব্দ শুনতে পেল সে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। চোখ মেলে দেখল দরজায় কারো ছায়া পড়ল। দরজা খুলে যাচ্ছে। তারপরই দেখা গেল তাকে। সেই রোগাপাতলা নার্স। রেবেকা। ওকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে। তারপরই হেঁসে ফেলল।

'উঠে পরেছেন?' হাঁসতে হাঁসতে জিজ্ঞেস করল তাকে। এগিয়ে আসতে শুরু করল।

হাঁসার চেষ্টা করল সেও। মনে হচ্ছে মুখটা অবশ হয়ে রয়েছে। মুখে কতটুকু হাঁসি ফুটল বোঝা গেল না।

'কেমন লাগছে এখন?' আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'ভাল।'

'দাঁড়াতে পারবেন মনে হয়?'

'মনে হয়।'

নামার চেষ্টা করল সে। সাথেসাথে নিষেধ করল মেয়েটা, 'থাক, থাক। শুধুশুধু নামতে হবে না। বসে থাকুন। ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না?'

'পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।'

শব্দ করে হেঁসে উঠল নার্স। একে মোটেই নার্স মনে হচ্ছে না এখন। মেডিকেলে থার্ডইয়ার পর্যন্ত পরেছে, মনে পরল তার। মেডিকেলে থার্ডইয়ারের ছাত্রী থাকলেই ভাল

মানাত। ঘরে ঢুকে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। সেখান থেকে কালো চেয়ারটা এনে বিছানার কাছে রেখে বসল তাতে। তাকে দেখছে। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টি।

একটুপর প্রশ্ন করল, 'কিছু মনে পরেছে?'

'কি?'

'আপনার নাম, ঠিকানা?'

কিছুক্ষন চুপ করে থাকল সে। তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এই একই বিষয় নিয়ে চলা যায় না। একটা নামের ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

সে বলল, 'আমার নাম অঞ্জন।'

'সত্যি?' আবার হাঁসছে মেয়েটা। হাঁসির শব্দ হচ্ছে না এখন। দাঁত ঝকঝক করছে। চোখের পাতা কাঁপছে। মনে হয় কালো রঙের কিছু দিয়েছে চোখের চারিদিকে। নয়ত এমনিতেই অতিরিক্ত কালো।

তার কথা বিশ্বাস করেনি, ভাবল সে। ধরে নিয়েছে সে ঠাট্টা করছে ওর সাথে।

'কে যেন অঞ্জন বলে ডাকল।' ব্যাখ্যা করল সে।

এবার হাঁসির শব্দ শোনা গেল মুহূর্তের জন্য। তারপর নিশ্চুপ হাঁসি। তারপর একসময় মুখ খুলল আবার। থেমে থেমে বলল, 'অঞ্জন আয়ার ছেলের নাম। ওর বয়স দেড় বছর।'

'আমার বয়সও দেড় বছর ।'

আবার নিঃশব্দ হাঁসি। মুখটিপে হাঁসছে মেয়েটা। এ ঠাট্টাই করছে। এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না সে। টেবিলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল একবার। তারপর বলল, 'আচ্ছা, ভাল। কিছু খাবেন? অনেক খাবার আছে আপনার জন্য।'

তার দৃষ্টি অনুসরন করে টেবিলের দিকে তাকাল অঞ্জন পরিচয় দেয়া যুবক। সত্যিই অনেক খাবার সেখানে। বিভিন্নরকম ফল, নানারকম প্যাকেট, একটা বড় ফ্লাস্ক। আগেরবার টেবিলটা ফাঁকা দেখেছিল, মনে আছে তার।

'কে এনেছে ওগুলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এখলাস সাহেব।' বলল রেবেকা, 'আপনার সবকিছু উনি দেখছেন। একটু স্যুপ দেই। কিছুক্ষন আগেই ওনার লোক এসে দিয়ে গেছে, এখনও গরম আছে মনেহয়।'

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রেবেকা। স্যুপ ঢালার প্রস'তি নিচ্ছে।

এখলাস সাহেব? কে সে? তার কোন নিকট আত্মীয়?

নিজের স্মৃতি ঝালাই করতে চাইল অঞ্জন। মনে পরছে না। মনেহচ্ছে এই নামের কাউকে সে চেনে না।

রেবেকা ফ্লাস্ক থেকে স্যুপ ঢালল খাটো একটা গ্লাশে। এগিয়ে এসে ওর হাতে দিল। হাত কাঁপছে ওর। গ্লাশটা হাতে নিয়ে চেষ্টা করে হাত স্থির করল। মুখে লাগিয়ে খেতে চেষ্টা করল। ঝাঁঝালো স্বাদ, তবে খেতে ভাল লাগছে। খিদে নেই এতটুকু, তবু সে বুঝতে পারছে শরীর দুর্বল হয়ে পরেছে। স্বাভাবিক হতে হলে ভাল করে খেতে হবে। একটু একটু করে

খেতে লাগল সে। দেখল গ্লাশটা তার হাতে দিয়ে রেবেকা আবার চেয়ারে বসেছে। বসে পা দোলাচ্ছে। এখনও পুরোপুরি নার্স হয়ে ওঠেনি।

একটু একটু করে খেয়ে গ্লাশ শেষ করল সে। গ্লাশের নিচের দিকে শক্ত কিছু জমা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে মাংশ জাতিয় কিছু।

'আরেকটু দেই। খেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।' বলল রেবেকা।

শেষ হওয়া গ্লাশটি নিয়ে আবারও স্যুপ ঢেলে দিল তাতে। এটাও শেষ করল সে। তারপর ওকে শুয়ে থাকতে বলে বাইরে চলে গেল রেবেকা।

আধঘন্টা কিংবা ঘন্টাখানেকপর একজন ডাক্তার এসে দেখে গেল ওকে। মোটা, মাঝবয়সী ডাক্তার। বেশ একটু ভুড়ি রয়েছে। মাথার সামনের দিকে টাক, মুখে সোজাসোজা ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা গোফ। পুরু লেন্সের চশমা। সিনেমা নাটকে ডাক্তার বুঝানোর জন্য যেমন ষ্টেথো ঝুলায় তেমনি ষ্টেথো ঝুলছে গলায়। মুখটা হাসিহাসি। কোথায় যেন এমন একটা ছবি দেখেছে সে।

মানুষের নাকি বেড়ালের?

দেখলেই মনেহয় এখনই মজার কোন কথা বলে ফেলবে। কোন কারনে জোর করে গম্ভীর হয়ে রয়েছে। রেবেকার সাথে নিচুস্বরে কথা বলল। মাথার পেছনে ঝুলানো কাগজ দেখল। তারদিকে চেয়ে হেঁসে 'কি ইয়াংম্যান' ছাড়া আর কোন কথা বলল না। কোন প্রশ্নও করল না তাকে। রেবেকার সাথে এত আস্তে কথা বলছে যে একেবারে কাছে থেকেও সে একটা কথাও বুঝতে পারছে না।

তার মনে হল ডাক্তার তাকে রুগী মনে করছে না। ডাক্তার হিসেবে তার কিছু করনীয় আছে মনে করছে না। কেমন অবাক করা চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে। বারবারই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে, যেন তার চোখ এড়িয়ে। একবার চোখাচুখি হওয়ায় অপ্রস'ত হয়ে মাথা নেড়ে হাঁসল।

একটু পর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ডাক্তার আর রেবেকা বাইরে চলে গেল। আবার শুয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করল সে। পরিস্কার বুঝতে পারছে ঘুমানো ছাড়া তার কিছুই করার নেই। সে উঠলেও হাঁটতে পারবে না। আরো একদিন কিংবা কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হবে তাকে।

ঘুমানোর সুযোগ পেল না সে। আবার কেউ ঢুকেছে। ও তাকিয়ে দেখল রেবেকা ঢুকছে। তার সাথেসাথেই ঢুকল সবুজ ধরনের ইউনিফর্ম পড়নে একজন লোক। হাঁটলে ভারী পায়ের খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতে খাতা কিংবা কাগজ। কোমড়ে পিস্তল।

পুলিশের লোক।

'ইনি একটু কথা বলবেন আপনার সাথে।' অঞ্জন তারদিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল রেবেকা। পুলিশ অফিসারের দিকে ঘুরল, 'খুব সংক্ষেপে সারবেন। উনি অসুস'।'

তার কথা যেন শুনতেই পেল না পুলিশ অফিসার। এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটা টেনে আনল বিছানার কাছে। ওর সামনাসামনি বসল।

রেবেকা এভাবে চেয়ার টানে না। এমনভাবে উচু করে আনে, এত সাবধানে নামায় যে এতটুকু শব্দ হয়না। বোঝা যাচ্ছে এ লোকটা এসবের ধার ধারে না। শব্দ করে যেন নিজের শক্তির জানান দেয়।

চেয়ারে বসে এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলল। তার ওপর খাতা রেখে খাতা খুলল। ঘুরে রেবেকার দিকে তাকাল। সে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছেই।

'আপনি বাইরে যান আমি আলাপ সারি।'

'আমি এখানেই থাকব।' জানাল রেবেকা।

'আমার জরুরী কথা আছে।'

'তাহলে উনি পুরো সুস' হলে তখন আসতে হবে। এখন কথা বললে আমি থাকব।'

দৃঢ়তার সাথে বলল রেবেকা। শুনে অবাক হল অঞ্জন। একেবারে অন্যরকম লাগছে এখন একে। হঠাৎ করেই খুব দায়িত্বশীল হয়ে গেছে যেন। নিজের মত থেকে এতটুকু সরবে না বোঝা যাচ্ছে। সে একটু উচু হয়ে হেলান দিয়ে বসল।

অফিসারকে রেবেকার কথা মেনে নিতে হল। অঞ্জনের দিকে ঘুরল সে। খাতার দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'নাম?'

'অঞ্জন।' একটু সময় নিয়ে উত্তর দিল অঞ্জন।

'পুরো নাম বলুন।'

'এটাই পুরো নাম।'

'হুঁ, ঠিকানা?'

'মনে নেই।'

'মনে নেই মানে?'

'মনে নেই মানে মনে নেই। মনে করতে পারছি না।'

'চেষ্টা করুন।'

'চেষ্টা করেছি। মনে পড়েনা।'

বিরক্ত হয়ে চেয়ে থাকল অফিসার অঞ্জনের দিকে। কপালে ভাঁজ পরেছে। বয়স বেশি না হলেও মনে হচ্ছে স্থায়ী হয়ে গেছে ভাঁজটা। হয়ত স্বভাবগত কারনে। অঞ্জন একবার রেবেকার দিকে তাকাল। রেবেকার মুখে বিরক্তি। দুই ঠোট চেপে রেখেছে। চোখ সরু।

যে কোন কারনেই হোক এধরনের জেরা পছন্দ করছে না সে।

'পেশা কি?' আবার প্রশ্ন শোনা গেল সামনের দিক থেকে।

উত্তর না দিয়ে তারদিকে ঘুরে তাকিয়ে থাকল অঞ্জন। অফিসারের মুখে আগের চেয়ে বেশি বিরক্তি ফুটে উঠছে।

'কি করেন?'

‘জানি না। মাথায় আঘাত লাগার পর কিছু মনে করতে পারছি না।’ রীতিমত ব্যাখ্যা করে বিষয়টি শেষ করতে চাইল সে।

বোঝা যাচ্ছে প্রশ্নকর্তা সন'ষ্ট হয়নি। অন্যপথে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

‘পিস্তলের লাইসেন্স আছে?’

হঠাৎ পিস্তলের কথা কেন এল বুঝল না সে। তাকিয়ে থাকল সে অবাক হয়ে।

‘পিস্তল চালানো শিখেছেন কোথায়?’ আবার প্রশ্ন শুরু করল অফিসার।

‘কোথাও না।’

‘কোথাও না মানে?’

‘মানে কখনো পিস্তল চালাইনি।’

‘চারটা গুলি ছুড়েছেন, চারজন মারা গেছে। ট্রেণিং ছাড়া কিভাবে সম্ভব?’

‘জানি না।’

‘জানিনা মানে কি?’

‘জানিনা মানে জানিনা। কখনো গুলি করিনি।’ এবার বিরক্তি না দেখিয়ে পারল না সে।

‘বলতে চাইছেন গুলি ছুড়লেন আর সেটা যায়গামত লাগলো? একটুও এদিক ওদিক হল না?’

‘আপনার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে।’

‘ওদের গায়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ছিল।’

‘আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।’

‘চারজনের গায়ে জ্যাকেট ছিল। চারজনেরই মাথায় গুলি লেগেছে। এটা কিভাবে হল?’

‘আমি জানিনা।’

‘সেটাই বিশ্বাস করতে বলেন?’

‘আমার যা বলার বলেছি, বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।’

‘আমি কি অন্যভাবে কথা বলাব?’

ভয় দেখাতে চাইছে। চোখ সরু করল অঞ্জন। এভাবে কৈফিয়ত দেয়ার অভ্যেস নেই তার। সে কোন অপরাধ করেনি এ বিশ্বাস তার আছে।

সাফ জবাব দিল সে, ‘আমি আমার ইচ্ছেয় কথা বলি। অন্যের ইচ্ছেয় বলি না।’

‘নিজের ইচ্ছেয় বলুন, ট্রেনিং কোথায় নিয়েছেন?’

অঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল অফিসার। অঞ্জনও অপলক তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। একেবারে আদর্শ মাথামোটা পুলিশ। নিজের গো ছাড়ছে না।

‘আর কোন কথার উত্তর দেব না।’ জানিয়ে দিল সে।

কথাটা বলেই শুয়ে পরল অঞ্জন। চোখ বন্ধ করল। এর সাথে তর্ক করার কোন অর্থ হয় না। তাকে কোন সন্ত্রাসী দলের কেউ হিসেবে পরিচিত করতে চাইছে। তার কৃতিত্ব বাড়বে এতে। এধরনের কাজ দেখালে কৃতিত্ব বাড়ে। প্রমোশন পাওয়া যায়।

বোঝা যাচ্ছে অঞ্জনের আচরনে রেগে গেছে পুলিশ অফিসার। ধৈর্য্য হারাল সে।

'রিমান্ডে নিলে কথা বলবেন?' গলার স্বর উচু করল সে।

এতক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিল, হঠাৎ করেই কথায় ঢুকল রেবেকা, 'আর কথা বলবেন না। উনি অসুস'। বিশ্রাম নিতে দিন।'

চোখ বন্ধ রেখেই দুজনের কথা শুনতে পেল অঞ্জন।

'আমার কাজ আমি বুঝি।' রাগত গলা অফিসারের।

রেবেকার কড়া গলা শোনা গেল এবার, 'উনি এখলাস সাহেবের পেশেন্ট। উনার সাথে কথা বলে তারপর আসবেন।'

'কথা বের করা জরুরী।'

'আপনি আসুন।' রীতিমত ধমক দিল রেবেকা, 'এরপর উনার পারমিশন নিয়ে আসবেন।'

রেগে গেছে অফিসার। যাকে প্রশ্ন করছে সে উত্তর দিচ্ছে না। এদিকে এই নার্স তাকে জেরা করতেও দিচ্ছে না। তাকে এভাবেই ফিরে যেতে হবে।

আর কথা বাড়াল না সে। ধাক্কাদিয়ে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। গটগট করে হেঁটে বাইরে গেল। তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল অঞ্জন। একটু পর দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনল। রেবেকাও বাইরে গেছে। চারিদিক নিশ্চুপ হয়ে গেল আবার।

কিছুক্ষন চুপ করে শুয়ে থাকল সে, তারপর একসময় উঠে বসল। বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসল। নিজে থেকেই বামহাত চলে গেল মাথায়। হাত বুলিয়ে দেখল সে। বেশ ফুলে রয়েছে এক যায়গায়। তবে ব্যথা নেই তেমন।

নিজের অবস্থান বুঝে গেছে সে। কোনভাবে মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। মাথা ফাঁটেনি, রক্ত বের হয়নি। ব্যথাও তেমন নেই। ফুলে আছে। কিন' সে ভুলে গেছে সবকিছু। নিজের নাম পর্যন্ত মনে করতে পারছে না। সে কোথায় থাকে, কি করে কিছুই মনে করতে পারছে না। এদিকে পুলিশ লেগেছে তার পিছনে। কি অপরাধ সে করেছে জানে না। সত্যিসত্যি কোন অপরাধ করলেও মনে নেই তার।

সে আর যাই করুক পুলিশ জেরা করার মত কাজ করেনি। তার মনে হচ্ছে সে ভালমানুষ। কোন ধরনের পুলিশি ঝামেলার মধ্যে জড়ায়নি কখনো। এধরনের কোন অভিজ্ঞতা তার নেই। পুলিশের সাথে কথা বলার কোন অভিজ্ঞতা নেই। একেবারেই সহ্য করতে পারছে না পুলিশ বিষয়টা।

কিছু একটা করতে হবে তাকে। জানতে হবে নিজের পরিচয়।

কি মনে করতে পারছে সে? আরেকবার সে চেষ্টা করল তার যাকিছু মনে আছে তা একসাথে জড়ো করতে।

কিছুই না। তার জগত যেন শুরু হয়েছে এখানে। তার পরিচিত বলতে নার্স রেবেকা, আরেকজন নাম না জানা নার্স, একজন ডাক্তার। বাইরে অঞ্জন নামে কেউ একজন। যেটা এখন তার নিজেরই নাম। এখলাস সাহেব নামে কেউ একজন।

এখলাস সাহেব। কে সে?

তার সবকিছু উনি দেখছেন, একথাই বলেছে রেবেকা। সন্মান করে কথা বলেছে। তারমানে বয়স্ক এবং সন্মানী কেউ। পুলিশ অফিসারকে এমনভাবে নাম বলেছে যেন তার পেসেন্টকে বিরক্ত করা যাবে না।

কে সে? তার আত্মীয়? তার গুরুজন?

এখনো তাকে দেখেনি সে।

নামার জন্য মেঝেতে পা রাখল সে। সাথেসাথে মাথা টলে উঠল তার। শক্তহাতে বিছানা ধরে পায়ে ভর রাখল। তক্ষুনি রেবেকা ঢুকল দরজা দিয়ে। ওকে দাঁড়াতে দেখে থমকে দাঁড়াল সেখানেই। তার মনে পড়ল আগে নিষেধ করেছিল উঠতে, এখন কিছু বলছে না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে। পা ফেলল অঞ্জন। মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল সাথেসাথে।

কোনমতে বিছানা ধরে সামলাল নিজেকে।

রেবেকা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ধরছে না। দাঁড়িয়ে নিজেকে সামাল দিল অঞ্জন। কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চেষ্টা করলে হাঁটতে পারবে মনে হচ্ছে।

'বাথরুমে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

মাথা নেড়ে সায় দিল সে। বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল।

হাঁ, পারবে সে হাঁটতে। কোনকিছু না ধরেই যেতে পারবে। রেবেকার দিকে তাকিয়ে হাঁসল সে। সে ঠিক আছে। রেবেকা ভেতরে ঢুকে চেয়ারটা উঠিয়ে টেবিলের কাছে নিয়ে রাখল। তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে টেবিলের জিনিষগুলি সাজাতে লাগল। সময় দিচ্ছে ওকে।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে একবার ঘরের বাইরে যাওয়ার কথা বলল রেবেকাকে। অন্তত বারান্দা থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে হল তার। এটা কোন যায়গা তাও জানে না সে। রেবেকা নিষেধ করায় এসে বসল খাটে।

'মনেহচ্ছে ভাল হয়ে গেছি। আমাকে কদিন থাকতে হবে এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

রেবেকা বলল, 'আপনার বিশ্রাম দরকার। ইচ্ছে করলে নিজের বাড়িতেও বিশ্রাম নিতে পারেন। এখানে আর করার কিছু নেই।'

এখন একটুকু হাঁসি নেই মেয়েটার মুখে। পুরোপুরি একজন নার্স। কিংবা ডাক্তার।

মাথা নিচু করে একমুহূর্ত ভাবল অঞ্জন। বাড়ি যেতে পারে সে। আবারও চেষ্টা করল বাড়ির কথা মনে করতে। না, বাড়ির কথা মনে করতে পারছে না সে। কখন পারবে জানা নেই।

'যদি বাড়ির কথা না মনে পড়ে?'

'তাহলেও আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখানে খরচ খুব বেশি। এখলাস সাহেব আপনার খরচ দিচ্ছেন।'

আবার এখলাস সাহেব।

'এখলাস সাহেব কে?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

উত্তর দিতে সময় নিল রেবেকা। অঞ্জন কিছুই মনে করতে পারছে না এটা যেন নতুন করে মনে পরল তার। তারপর বলল, 'আমি যতদুর জানি আপনি উনার মেয়ে আর নাতনীতে রক্ষা করেছেন সন্ত্রাসীদের হাত থেকে। সেটা করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছেন।'

অঞ্জন বলল, 'উনাকে একবারও দেখলাম না-'

রেবেকা বলল, 'এসেছিলেন। তখন আপনি অচেতন। মনে হয় ব্যস্ততার জন্য পরে আসতে পারেননি।'

'হুঁ।'

নিজেকে অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে আবিস্কার করল অঞ্জন। যদি ওর নাম অঞ্জন হয়।

সে চিন্তা করতে পারছে। সে বুঝতে পারছে এই মেয়েটা চায় না সে এখানে থাকুক। এখানে থেকে আরেকজনের টাকা খরচ করুক। এখানে অনেক খরচ। সে এখলাস সাহেবের খরচ বাঁচাতে চাইছে কেন? তার সন্মান রাখার জন্য? খরচ বেশি মানে নিশ্চয়ই বেসরকারী হাসপাতাল। এখানে থাকলে তার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভ, তবুও সে সেটা চায় না। কোন কারনে সে তার পক্ষ নিয়েছে। পুলিশকে বাধা দিয়েছে জেরা করতে। এখন তাকে নিজের বাড়িতে ফেরত যেতে বলছে।

অথচ বাড়ির কথা কিছুই মনে করতে পারছেনা সে। এমনকি নিজের নামও না। পরিচিত কারো কথা না। তার মস্তিস্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে শুধু ভুলে গেছে আগের সবকিছু।

সামনের দিকে তাকাল সে। অপেক্ষা করছে রেবেকা।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অঞ্জন। বলল, 'এখলাস সাহেবের সাথে যোগাযোগ হলে বলবেন আমি হাসপাতাল ছাড়তে চাই।'

'বলব।'

'আমি একটু হাঁটাহাটি করি। কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

রেবেকা আপত্তি করল না তাতে। বলল, 'করুন। অসুবিধে মনে করলে শুয়ে থাকবেন। একটু পর অন্য নার্স আসবেন। কোন সমস্যা হলে তাকে বলবেন।'

বাইরে গেল রেবেকা।

বিকেলে অঞ্জন খবর পেল ইচ্ছে করলে পরদিন হাসপাতাল ছাড়তে পারবে সে।

কালো রঙের বড় একটা জীপে চড়ে হাসপাতাল ছাড়ল অঞ্জন। খুব দামী গাড়ি সন্দেহ নেই। মাঝখানের সিটে সে একাই বসল। পিছনের সিটে দুজন, সামনে ড্রাইভার একা। গাড়ি কোনদিকে যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করল না সে। রাস্তায় প্রচন্ড ভীড়। অসংখ্য গাড়ি,

রিক্সা, মানুষ। লক্ষ্য করল বাইরের কোন হট্টগোল গাড়ির ভেতরে ঢুকছে না। চারিদিকে সবাই যেন নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। সোজা সামনের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকল সে।

মিনিট বিশেক পর কিংবা আধঘন্টা পর বড় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। বন্ধ লোহার গেট। ইউনিফর্মপরা পুলিশ দাঁড়িয়ে সেখানে। গাড়ি দেখেই কে একজন গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে বারান্দার কাছে থামল গাড়িটা। পিছনের লোকদুজন নেমে দরজা খুলে ধরায় নামল। নেমে চারিদিকে একবার চোখ বুলাল অঞ্জন। এটা বাড়ি না, মনেহয় অফিস। চারিদিকে ছিমছাম সাজানো গোছানো। বারান্দার সামনে পতাকা লাগানোর পোল।

লোকদুজন বারান্দায় উঠে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল তাকে। সে তাদের সাথে ভেতরে ঢুকল। পুরনো বিল্ডিং হলেও ঝকঝকে পরিস্কার মেঝে। ভেতরের বড় একটা ঘরে পৌছাল ওরা। বয়স্ক এক ব্যক্তি বসে রয়েছেন বড় টেবিলের পিছনে। বড় টেবিলটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ঝকঝকে পরিস্কার ঘর। একদিকে একসার লাল রঙের সোফা। এছাড়া ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা, বিশাল আকারের।

ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক তাকালেন তার দিকে। তার আন্তরিক গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, অঞ্জন। আসুন। কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'বসুন। চা খাবেন না কফি খাবেন?'

কোন উত্তর দিল না অঞ্জন। এগিয়ে এসে আস্তে করে টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসল।

বুঝতে পারছে সে। তার সামনে বসে আছে পুলিশের বড় কোন কর্মকর্তা। ইউনিফর্ম পরা নেই, তবু সে বুঝতে পারছে এই লোক পুলিশ জাতিয় কিছু। এটা থানা না, তারচেয়ে বড় কোন অফিস। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পায়নি। ছোট অফিসার থেকে বড় অফিসারের সামনে আনা হয়েছে তাকে। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সে।

'কফি দিতে বলি। এতে শরীর চাঙা হয়। সিগারেট খান?'
আন্তরিকভাবেই কথা শুরু করলেন ভদ্রলোক।

'খাই।'

সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার এগিয়ে দিলেন তিনি সামনে। সোনালী রঙের প্যাকেট। সুন্দর সাদা লাইটার। অঞ্জনের সামনে রেখে বললেন, 'নিন একটা ধরান। অসুবিধে নেই, জানালা খুলে দিচ্ছি।'

লোকদুজন দাঁড়িয়ে আছে এখনো। তিনি একজনের দিকে তাকাতেই সে ভদ্রলোকের পিছনদিকের জানালা খুলে দিল। সেদিকে বাগান, মুহুর্তের জন্য দেখা গেল। মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। জানালা খোলা থাকলেও এখন বাইরে দেখা যাচ্ছে না। জানালা খুলেই লোকদুজন চলে গেল বাইরে। সে সিগারেট ধরিয়ে টান দিল। ভদ্রলোক এ্যাসট্রে এগিয়ে দিলেন। বোঝা যাচ্ছে তিনিও এখানে ধুমপান করেন।

সিগারেটে টান দিতেই মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল তার। হয়ত অসুস'তার জন্য, হয়তো অনেকক্ষন পর খাওয়ার জন্য।

ধোঁয়া ছেড়ে কোনমতে সেটা সামলে সামনের দিকে তাকাল। সামনের ভদ্রলোককে অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। কিছুএকটা ভাবছেন। টেবিলে হাত রেখে হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? চারটা খুন?' নিজে থেকেই কথা শুরু করল অঞ্জন।

'অভিযোগ!' যেন অবাক হলেন ভদ্রলোক। সোজাসুজি তাকালেন তার দিকে। একটু সময় নিলেন উত্তর দিতে। তারপর অবাক হয়েই যেন বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হচ্ছে না। আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে চলে যাবেন।'

'ভেবেছিলাম হাজতে পাঠানো হবে।' সরাসরি নিজের মনে হওয়া কথাটাই বলল অঞ্জন।

ভদ্রলোক নিচুস্বরে বললেন, 'সেজন্য দুঃখিত। আপনার সাথে কেউ কোন খারাপ আচরন করে থাকলে ক্ষমা করবেন।'

অবাক হল অঞ্জন। সে যা ভেবেছিল বিষয়টা তেমন না দেখা যাচ্ছে। সে যেতে পারে যেখানে যেতে চায়।

তাহলে তাকে এখানে আনা হয়েছে কেন? কে এই ভদ্রলোক?

মাথা নিচু করে ভাবছেন ভদ্রলোক। কোন সমস্যার কথা ভাবছেন হয়ত। ট্রেতে করে কফি দিয়ে গেল একজন। চিনি আলাদা। তিনি নিজেই চিনি মেশালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনি বেশি না কম?'

'কম।'

'নিন। আমি চিনি খাইনা।'

কাপ এগিয়ে দিলেন তিনি অঞ্জনের দিকে। পিরিচের বদলে ছোট ছোট পাটের তৈরী নক্সাকরা গোল বস'। নাম মনে করতে পারল না অঞ্জন।

নিঃশব্দে কফি খেতে লাগল দুজন। ভাল লাগছে খেতে। কফি শেষ করেও অনেকক্ষন চুপ করে থাকল দুজনই। একসময় ভদ্রলোক মুখ খুললেন। বললেন, 'ওরা বলল আপনি ঠিকানা জানাননি। জানালে পৌছে দেয়া যেত। আপনি পুরোপুরি সুন' নন।'

'আমি নিজেই যেতে পারব।' যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল সে।

তিনি বললেন, 'আমার কিছু করার থাকলে জানাবেন। সংকোচ করবেন না। নাসরিন আপনাকে দাওয়াত করেছে। বলেছে আপনি গেলে খুব খুশী হবে।'

উত্তরের অপেক্ষা করছেন তিনি।

'কে?' বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল সে।

তিনি বললেন, 'নাসরিন, আমার মেয়ে। আপনি যার জীবন বাঁচিয়েছেন। জেসমিনও খুব খুশী হবে আপনাকে দেখলে। আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

মাথার যন্ত্রনাটা আবার বেড়েছে। দপদপ করছে।

নাসরিন। জেসমিন। কে ওরা?

মনে করার চেষ্টা করল অঞ্জন। কার যেন মেয়ে এবং নাতনীকে বাঁচানোর কথা বলেছিল রেবেকা। তখন কিছুই মনে করতে পারেনি সে। এখন একটু যেন মনে পরছে।

ছোট্ট একটা মেয়ে। সামনে দাঁত নেই। হাসছে। পরমুহূর্তেই হারিয়ে গেল দৃশ্যটা।

চোখ বন্ধ করে নিজেকে সামলে নিল অঞ্জন। বুঝতে পারছে সে, নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা উঠলেই ওর মাথায় ব্যথা করছে। যেখানে রয়েছে ওই কথাগুলো। কিছুতেই ব্যবহার করতে পারছে না সে যায়গাটা। নার্স বলেছিল কমপ্লিট রেষ্ট দরকার। চিন্তা করা যাবে না।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি যেখানে যেতে চান আমার গাড়ি আপনাকে পৌছে দেবে।'

সে উত্তর করল, 'আমি নিজেই চলে যাব।'

'আচ্ছা।' কোনকিছুতেই আপত্তি করছেন না ভদ্রলোক। বললেন, 'আপনার কাছে টাকাপয়সা নেই বোধহয়। সুযোগ পেয়ে কেউ বের করে নিয়েছে। হাতের ঘড়িটাও গেছে দেখা যাচ্ছে। অন্য দামী কিছু ছিল?'

'না।'

'আচ্ছা এই টাকাগুলো রাখুন। এখানে পাঁচ হাজার আছে। কিছু খুচরো টাকাও আছে। সংকোচ করবেন না, এটা ধার। আপনার যখন সুবিধে হয় ফেরত দেবেন। আর এই আমার কার্ড। ফোন নাম্বার আছে যখন প্রয়োজন মনে করবেন ফোন করবেন। কোনরকম হেজিটেট করবেন না। আমার দরজা আপনার জন্য খোলা।'

মনে হল আগে থেকেই আলাদা করে সাদা খামে রাখা হয়েছে তারজন্য। খাম আর কার্ড হাতে নিল অঞ্জন। কার্ডটা পড়ল। এমডি এখলাস উদ্দিন আহমাদ। এর নামই বলেছিল রেবেকা। আরেকবার ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে খাম আর কার্ড একসাথে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এখানে বসে থাকার কোন প্রয়োজন নেই তার। এই ভদ্রলোক তার কথা শেষ করেছেন। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিজের কাজ করবেন।

'আমি উঠি।'

'হ্যাঁ। বাইরে গাড়ি আছে। ড্রাইভার আপনাকে সুবিধেমত যায়গায় নামিয়ে দেবে।'

কিভাবে জানতে পেল বুঝল না অঞ্জন, দেখল সেই দুজনের একজন এসে ঢুকল। এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। তারদিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন ভদ্রলোক। বললেন, 'বাইরে লোক কিসের?'

'সাংবাদিক, স্যার। ওনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'খবর পেল কিভাবে?' কপালে ভাঁজ পড়ল তার।

'মনেহয় হাসপাতাল থেকে জেনেছে।'

'হুঁ।'

বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি পছন্দ করছেন না তিনি।

তারজন্য অপেক্ষা করছে সাংবাদিক। তারমানে তাদের সামনে পরলেই নানারকম প্রশ্ন করবে। কি বলবে সে? তার তো নিজের নামই মনে নেই।

'অন্য কোনদিক দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

একবার অঞ্জনের মুখের দিকে তাকালেন এখলাস সাহেব। তারপর লোকটির দিকে ফিরলেন।

'ওদিক দিয়ে বাইরে নিয়ে যাও। যাওয়ার দশ মিনিট পর সাংবাদিকদের বলবে উনি চলে গেছেন।' গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিলেন এখলাস সাহেব।

'আসুন।' বলল অপর লোকটা। বলে ঘুরে পা বাড়াল যাওয়ার জন্য। অঞ্জন অনুসরন করল তাকে।

অনেক বড় বিল্ডিং। অনেকগুলো টানা ঘর, লম্বা বারান্দা। দেখেই বোঝা যায় অনেক আগে তৈরী হয়েছে এটা। বারান্দায় অনেকটা হেঁটে, তারপর বাগান পার হয়ে একটা ঘরের ভেতর দিয়ে একসময় রাস্তায় বের হল ওরা। এটা বিল্ডিংএর পিছন দিক। একেবারে ফাঁকা রাস্তা। সামনেই একটা নীল গাড়ি দাঁড়িয়ে। আগের গাড়িটা কালো রঙের জিপ ছিল। এই গাড়িটা ছোট। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল সাথের লোকটা। কোন কথা না বলে ড্রাইভারের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু ইঙ্গিত করে চলে গেল।

অঞ্জন উঠে বসল পিছনের সিটে।

'কোথায় যাবেন?' জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'একটু দুরে কোথাও নামিয়ে দিলেই হবে।' বলল সে।

'কোনদিকে?'

'যে কোন দিকে।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। যায়গাটা চিনতে পারল না অঞ্জন। চেনার চেষ্টাও করল না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে এটা সংরক্ষিত এলাকা। রাস্তায় লোকজন একেবারেই নেই। বাড়িগুলি বড়বড়, ফাঁকাফাঁকা। মনেহয় সবগুলোই এধরনের অফিস।

কিছুক্ষন পরই শহরের ভীড়ের মধ্যে এসে পরল ওরা। তারপর একসময় রাস্তা চিনতে পারল পারল অঞ্জন। ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছে। শাহবাগ মোড় ঘুরে সোজা এগিয়ে গেল। শেরাটন হোটেল পেরিয়ে বাংলামোটরের কাছে সিগন্যালে গাড়ি থামল। রাস্তায় গাড়ির ভীড়। বেশ লম্বা লাইন গাড়ির।

'আমি এখানে নামছি।'

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই দরজা খুলে নেমে পরল অঞ্জন। কিছুদুর সামনে এগিয়ে বামদিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। দেখল সিগন্যাল সবুজ হতেই গাড়িটা চলে গেল সামনে।

হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। অবাক হল অঞ্জন। অচেনা মনে হচ্ছে যায়গাটা। অনেক পরিবর্তন হয়েছে এদিকে। সব নতুন মনে হচ্ছে। ওর সামনেই বিশাল একটা বিল্ডিং। আগে এখানে এতবড় বিল্ডিং ছিল না।

আগে? কত আগে? কত আগের কথা মনে হচ্ছে ওর? কতদিন পর সে এসেছে এখানে?

আবারও মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল ওর। কিছু মনে করতে চেষ্টা করলেই এটা হচ্ছে। ট্যাবলেট খেতে বলেছিল ওকে ডাক্তার। কি ট্যাবলেট মনে নেই ওর। ওর কাছে প্রেসক্রিপশন নেই। সেটা যে কোথায় থেকে গেছে তাও মনে নেই। বের হওয়ার সময় রেবেকা থাকলে ঠিক মনে করে দিয়ে দিত।

রেবেকার কথা ভাবতে ভাল লাগছে। কষ্ট হচ্ছে না ওর কথা মনে করতে। একমাত্র এই কথাটাই চাপ তৈরী করছে না ওর ব্রেনে। মনে হচ্ছে আশেপাশেই কোথাও আছে মেয়েটা। যে কোন সময় দেখা হয়ে যাবে।

সামনে এগিয়ে এসে মোড় থেকে ডানদিকে ঘুরল অঞ্জন। হাঁটতে হাঁটতে সার্ক ফোয়ারার মোড়ে এসে দাঁড়াল সে।

এখন?

কোনদিকে যাবে সে?

যাবেই বা কোথায়?

তার ঠিকানা কি?

যাওয়ার মত কোন যায়গা চেনে না সে, কাউকে চেনে না। তার জানা পৃথিবী একেবারেই ছোট। তার পকেটে রয়েছে এখলাসউদ্দিন নামে একজনের ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার। আর কিছু টাকা।

আর?

হাসপাতাল চেনে সে। ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারবে। সেখানে রেবেকা রয়েছে, আরেকজন নার্স রয়েছে, একজন ডাক্তার রয়েছে। এরা তাকে চেনে।

আর কে চেনে তাকে? সে আর কাকে চেনে?

চারিদিকে শতশত মানুষ চলাফেরা করছে। এদের একজনও চেনে না তাকে। সে চেনেনা এদের একজনকেও। এই পরিস্থিতিতে কি করতে পারে সে? একা একজন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকে? একা জঙ্গলে থাকলে সে সেটা মেনে নেয়, চেষ্টা করে খাবার জোগাড় করতে, বেঁচে থাকতে। এখানে সে কি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? এই মুহূর্তে তার খাওয়ার চিন্তা নেই। ইচ্ছে করলেই খাবার কিনে খেতে পারবে। ইচ্ছে করলে এই টাকায় কোথাও থাকার ব্যবস্থাও করতে পারবে। তারপর?

একসময় টাকা শেষ হবে। খাবার, আশ্রয় কিছুই থাকবে না। তখন? তখন আয় করতে হবে তাকে। এখানে বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র পথ।

অথবা খুঁজে বের করতে হবে তার পরিচিত কাউকে। যে তাকে আশ্রয় দেবে, সাহস জোগাবে, পথ দেখাবে।

তেমন একজনের কথাও মনে করতে পারছে না সে। মানুষ নাকি অভ্যাসবসেই নিজের বাড়ির দিকে যায়। পা তাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়িতে। ওর পা কোনদিকে যাচ্ছে না। ও বুঝতে পারছে না ওর বাড়ি কোনদিকে। সবদিকই অপরিচিত মনে হচ্ছে তার কাছে।

তবে কি ও ঢাকা শহরের কেউ না? অন্য কোথাও থাকে? কোনভাবে সে চেনে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট।

চেনে তো বটেই। ও জানে ওর ডানদিকের রাস্তার ওপারের হোটেলটার নাম সোনারগাঁ। তার সামনের বিল্ডিংটার গায়ে লেখা আছে ইটিভি। ওটা একুশে টিভির অফিস। সোজা সামনের দিকে গেলে ফার্মগেট, বামদিকে গেলে ধানমন্ডি। এই রাস্তার নাম পান'পথ। একটু দুরে বিশাল একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। ওটার নাম বসুন্ধরা।

একটা গাড়ি ব্রেক করল ওর একেবারে কাছে। চমকে ফুটপাতে সরে গেল অঞ্জন। অন্যমনস্কভাবে রাস্তার ওপর এসে পরেছিল। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকাল ড্রাইভারের দিকে। ড্রাইভার তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ড্রাইভারের মুখে বিরক্তি। তারপরই সেই বিরক্তি সরে গেল। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চেনার চেষ্টা করছে তাকে। পরিচিত কেউ? পরিচিতের মতই হাঁসল তারদিকে চেয়ে।

কি করবে বুঝতে পেল না অঞ্জন।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। মোড় থেকে একটু সামনে এগিয়ে গতি কমল। বামদিকে রাস্তার পাশে একটা ফার্নিচারের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে রেখে গাড়ির চালক নেমে এগিয়ে এল ওর দিকে। মুখে অমায়িক হাঁসি।

‘আরে আপনি, কেমন আছেন?’

হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে ধরেছে লোকটা। দাঁত বের করে হাঁসছে। হাত ধরল অঞ্জন।

‘ভাল।’

‘গাড়ি পাচ্ছেন না? কোনদিকে যাবেন? চলুন নামিয়ে দিই।’

নিজের গাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল লোকটা। ডানহাত দিয়ে এখনও অঞ্জনের হাত ধরে রেখেছে। বেশ শক্ত হাত। এখনও মুখে হাঁসি লেগে রয়েছে। হাঁসির জন্যই যেন তৈরী হয়েছে এই চেহারা।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল অঞ্জন। তার পরিচিত কেউ। পরিচিত কাউকে দেখলে মনে পরবে সবকিছু। চিনতে চেষ্টা করল সে।

না, এই লোককে সে চিনতে পারছে না। যেন কখনো দেখেনি এই লোককে।

ওদের চারিদিকে হৈ চৈ এর শব্দ। গাড়ি চলছে ভীড় করে, লোকজন হল্লা করছে। পুলিশের বাঁশি শোনা যাচ্ছে। একটু দুরে একজন ট্রাফিক পুলিশ বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সম্ভবত গাড়িটার দাম আর মালিকের পোষাক বিবেচনা করে গালাগালি চেপে রেখেছে।

‘আসুন গাড়িতে উঠুন আগে। এখানে বেশিক্ষন গাড়ি রাখা যাবে না।’

হাত ছেড়ে দ্রুত গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। ড্রাইভিং সিটে বসে বামদিকের দরজা খুলে ধরল। অঞ্জন কোন কথা না বলে এসে বসল তার পাশে। গাড়ি চলতে শুরু করল পান'পথ ধরে সোজা সামনের দিকে।

তারদিকে ফিরল লোকটা, 'আমাকে চিনতে পারেননি বোধহয়। অবশ্য খুব অল্প সময়ের পরিচয়, মনে না থাকা দোষের না। আমি কিন' আপনাকে ভুলবনা জীবনেও। আপনি আমার যা উপকার করেছিলেন। এয়ার পোর্টে। মনে পড়েছে? সেদিন আপনি না থাকলে কি যে কেলেংকারি হত। আমার নাম সেলিম। সেলিম খন্দকার।'

রাস্তার সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল অঞ্জন। সে মনে করতে পারছেনা কিছুই। হয়ত এর কথাই ঠিক। সত্যিসত্যিই সে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল তাকে। লোকটা ঠিকই চিনেছে তাকে, সে চিনতে পারছে না। কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, একে সোজাসুজি সবকথা বলে দেয়াই ভাল।

অঞ্জন বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমার একটা একসিডেন্ট হয়েছিল। মাথায় আঘাত লেগেছে। এখন পরিচিত কাউকেই চিনতে পারছি না।'

লোকটা চমকে একবার তাকাল তার দিকে। অঞ্জন চেয়ে আছে সামনের দিকে। একেবারে ভাবলেশহীন মুখ।

অঞ্জনের অদ্ভুত আচরন, তারপর এই বক্তব্য। মুহূর্তে তার হাসিভাব চলে গেল মুখ থেকে। কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না তার মুখে। ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে থাকল।

'এখন কি বাসায় যাবেন?' একসময় জিজ্ঞেস করল সেলিম।

'জানি না। বাসার ঠিকানা মনে করতে পারছি না।' আগের মতই ভাবলেশহীন গলায় জানাল অঞ্জন।

'তাহলে? কোথায় যাচ্ছিলেন?' রীতিমত অবাক হল সেলিম।

'জানি না কোথায়।'

বলে চুপ করে থাকল অঞ্জন। কি বলবে সে খুঁজে পেল না। তারপর মনে হল এই লোক তার কথা ঠিকমত বুঝতে পারেনি। নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে জানাল তাকে, 'কিছুক্ষন আগে ছাড়া পেয়েছি হাসপাতাল থেকে। দেখছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছু দেখে মনে পরে বাড়ির কথা।'

'ও।'

চুপ করে গাড়ি চালাতে লাগল লোকটা। এই রাস্তায় ভীড় বেশ কম। সেলিম নামের ভদ্রলোক গতি একেবারে কমিয়ে দিয়েছে গাড়ির। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে রাসেল স্কোয়ারের দিকে। দেখে বোঝা যাচ্ছে ভাবছে সেও। বোধহয় এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো পরেনি।

তাকে একবার দেখল অঞ্জন।

নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত, ভাবল অঞ্জন। গাড়িটাও বেশ দামি। নিশ্চয়ই নিজের। পোষাক মার্জিত। কোন রঙচঙের বাহার নেই, বরং বয়সের তুলনায় বেশ ভারিক্কি ধরনের। কোন অফিসের বড় কর্মকর্তা। অথবা নিজেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। টাকাপয়সা যথেষ্ট আছে এতে সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, অবাঞ্চিত কিছু বলেনি এখন পর্যন্ত। হিসেব করছে কি বলা যায়।

'আপনার কিছুই মনে পরছে না?' আরেকবার জানতে চাইল সে।

‘না। শুধু মনে হচ্ছে আমার নাম অঞ্জন। আর কিছুই মনে করতে পারছি না। মনে করতে চেষ্টা করলেই মাথায় ব্যথা করছে।’

একেবারেই ধীর গতিতে চলছে এখন গাড়ি। একসময় সেটাকে থামিয়ে দিল সেলিম। রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে বসে থাকল চুপ করে।

পরিস্থিতি কোনদিকে যাচ্ছে বুঝছে না অঞ্জন। এই লোকের গাড়িতে কতক্ষন বসে থাকবে সে? এরপর কি করবে?

সেলিম মুখ খুলল একটুপর। বলল, ‘আপনার ভালমত বিশ্রাম নেয়া দরকার। একটা ঠিকানা দরকার সকলের আগে। চলুন আগে সে ব্যবস্থা করি। আমাদের বাড়ি আছে মোহাম্মদপুর। ভাড়া দেয়া। আমি অবশ্য ফ্যামিলি নিয়ে থাকি গাজীপুর। এখানে আলাদা একটা ঘর আছে, ঢাকায় থাকা দরকার হলে উঠি। আপনি আপাতত সেখানেই উঠুন।’

কিছু বলল না অঞ্জন। গাড়ি ষ্টার্ট দিয়ে ডানদিকে মোড় নিল। আড়ংএর সামনে দিয়ে এসে আসাদগেট দিয়ে ঢুকল।

সেলিম কথা বলে যাচ্ছে, ‘যিনি ভাড়া থাকেন উনাকে আমি খালু বলি। বহুদিন থেকে চিনি ওনাকে। খুব অমায়িক ভদ্রলোক। আপনার ভাল লাগবে। ওখানে থাকলে খুব ভালভাবে বিশ্রাম নিতে পারবেন। তারপর একটাকিছু ঠিক করা যাবে।’

সেলিমের গলা এখন অসম্ভব রকমের আন্তরিক। বোঝা যাচ্ছে অঞ্জন, কিংবা নাম যাই হোক, সে তার কোন উপকার করেছিল কোন একসময়। সে ভোলেনি সেটা। এখন সুযোগ পেয়ে প্রতিদান দিচ্ছে।

সবাই সেটা করে না, একবার মনে হল অঞ্জনের। কেন মনে হল সেকথা সে নিজেও বলতে পারবে না। সে জিজ্ঞেস করল, ‘অপরিচিত কেউ পরিবারের মধ্যে থাকলে বিরক্ত হবেন না ওনারা?’

সেলিম আস্তে করে হাঁসল। তারপর বলল, ‘একবার ওদের দেখলে একথা বলবেন না। ওরা একেবারেই অন্যরকম মানুষ। আর আপনাকে পরিবারের মধ্যে ঢুকতেও হবে না। আমি যে ঘর ব্যবহার করি সেটা একেবারে আলাদা। ইচ্ছে করলে পরিবারের সাথে কোনরকম যোগাযোগ না রেখেই চলতে পারবেন।’

এখন পরিস্থিতির ওপর কোন নিয়ন্ত্রন নেই অঞ্জনের। সে বড়জোর আপত্তি করে এখান থেকে চলে যেতে পারে, কিন' সেটা করে সে যাবে কোথায়? নিজের শরীরের অবস্থা সে বুঝতে পারছে। এখনো শক্তি পাচ্ছে না সে। অকারনে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করার মত অবস্থা তার একেবারেই নেই। যেভাবেই হোক তাকে নিজের পরিচয় বের করতে হবে। আর সেজন্য তাকে কিছুদিনের জন্য হলেও কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। বিশ্রাম নিতে হবে, ঘুমাতে হবে, খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

সেলিমের গাড়িটা মোহাম্মদপুরের যে বাড়ির সামনে থামল সেটা দেখে পছন্দ হল অঞ্জনের। দেখে নিজের বাড়ি বলে মনে হয়। একসার ইউক্যালিপটাস দিয়ে ঢাকা একতলা বাড়ি। আশেপাশের বাড়িগুলি উচু হয়ে উঠে গেলেও এর মালিক ওপথে যাননি। গেটের

ভেতরে অনেকটা ফাঁকা যায়গা বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। তার পিছনে অনেকটা যায়গা নিয়ে সাদা রঙের একতলা। রঙ পুরনো হলেও পরিস্কার।

বাড়ির সামনে রাস্তায় গাড়ি রেখে নামল সেলিম। এগিয়ে গিয়ে কালো রঙের লোহার গেট খুলল। গেট খোলার শব্দ শুনে ঘরের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল সেলিমকে, তারপরই এগিয়ে আসতে শুরু করল। গাড়ীতে বসে অঞ্জন তার উত্তেজিত কথা শুনতে পেল।

'ও সেলিম ভাইয়া। ক্যামন আছেন? আমার ছবি কোথায়?'

'ওহ-হো নিলু, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। ওটা আনতে ভুলে গেছি।' কোন মতে কৈফিয়ত দিল সেলিম।

'ভুলেই তো যাবেন। আমি যে বললাম গিঠ্ঠু দিয়ে দেই, মনে থাকবে। তখন শুনলেন নাতো আমার কথা। এখন দেখুন আমি ঠিক কথা বলি কিনা। কি- বলি ঠিক কথা।'

'হ্যাঁ নিলু, তুমি ঠিক কথা বল। কিন' এখন একটু কাজ করতে হবে আগে। চট করে ওই ঘরটা খোল তো। আমার চাবি আনতে মনে নেই। এই যে অঞ্জন, আসুন।'

কথা বলার ধরন দেখে অঞ্জনের একবার মনে হল বয়সের তুলনায় সেলিম অনেক পরিনত। কোন কাজটা জরুরী বোঝে, সেটা ঠিক কিভাবে করতে হবে জানে। অঞ্জন তখনও বসে আছে গাড়িতে। এবার দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল সে। দেখল মেয়েটা অবাক হয়ে চেয়ে আছে তারদিকে।

'নিলু, এ হচ্ছে অঞ্জন ভাইয়া। এখানে কদিন থাকবে।'

'স্লামালেকুম।' সাথেসাথে বলল মেয়েটা।

অঞ্জন দেখল মেয়েটাকে। রোগাপাতলা। বেশ লম্বা। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলে সবুজ রঙের ফ্রক পড়েছে। একই রঙের পাজামা। গলার সাথে সাদা ওড়না পেঁচানো। বয়স বোঝা যায়না। প্রথমে মনে হল চৌদ্দ-পনের তারপর মনেহল আরো বেশীও হতে পারে। বড়বড় আয়ত চোখ। রাজ্যের কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে তারদিকে। নিলুর সালামের উত্তর দিতেও ভুলে গেল অঞ্জন।

সেলিম তাড়া দিল মেয়েটাকে, 'নিলু, ঘরটা খোল আর তোমার মাকে বল। আসুন অঞ্জন।'

সেলিমের পিছনে হেঁটে এসে বারান্দায় উঠল অঞ্জন। অপেক্ষা করল নিলুর ফেরার। নিলু ফিরে বারান্দার বামদিকের একটা ঘর খুলে দিল নিজেই। তালা খুলে পরদা সরিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুলে দিল। সেদিকে এগোল দুজন।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই আলো জ্বালল সেলিম। বোঝা যায় বেশ কিছুদিন এঘর খোলা হয়নি। গুমোট হাওয়া।

'জানালাগুলো খুলে দাওতো নিলু।'

নিজে একটা কাপড় নিয়ে চেয়ার টেবিল ঝেড়ে পরিস্কার করতে শুরু করল সেলিম। পুরু হয়ে ধুলো পড়েছে সবযায়গায়। খালি চোখেই পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল অঞ্জন। বেশ বড় ঘর। একপাশে বিশাল বিছানা। ওপাশের দরজাটা মনে হয়

বাথরুমের। ঘরে পড়ার টেবিল, বুক সেলফ, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আলনা এসব সাজানো। সবকিছু রাখার পরও বেশখানিকটা যায়গা ফাঁকা থেকে গেছে। এককোনে টুলের ওপর ছোট একটা টিভি। সেটা চালু করে দিল সেলিম।

অঞ্জনকে বলল, 'বসুন। জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে নিন, ভাল লাগবে। নিলু স্যান্ডেল আছে নাকি দেখতো।'

নিলু নামের মেয়েটা আলনার নিচ থেকে একজোড়া স্যান্ডেল এনে সামনে রাখল। রেখে একপাশে সরে দাঁড়াল। সে এখনো বুঝে উঠতে পারছে না পরিস্থিতি।

'আপনি বসুন আমি এক্ষুনি আসছি।' অঞ্জনকে বলল সেলিম। বলে বাইরে গেল। সাথে নিলুও।

বিছানায় বসে আলনার দিকে তাকাল অঞ্জন। সেলিমের জামাকাপড় রয়েছে সেখানে। সাথে মেয়েদের পোষাকও দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর। টেবিলে একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেলিমের সাথে একজন মহিলা, সাথে বছর দুয়ের একটা ছেলে। নিশ্চয়ই সেলিমের পরিবার। ঢাকায় এলে এরাই এঘরে থাকে।

কাপড় ছাড়লে সেলিমের পোষাক পরতে হবে। অপরের পোষাক পরতে ইচ্ছে করছে না তার। এখানে থাকলে পরতে হবে। নয়ত কিনতে হবে। অন্তত সেলিমের প্যান্ট তার হবে না। সেলিম তারেচেয়ে খাটো।

বিছানায় বসে জুতা খুলল অঞ্জন। তারপর পা সোজা করে সেভাবেই বসে থাকল টিভির দিকে তাকিয়ে। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সরাসরি দেখাচ্ছে বাংলাদেশ দক্ষিন আফ্রিকার খেলা।

সেলিম ফিরল বেশ সময় নিয়ে। সাথে একজন ভদ্রমহিলা। নিশ্চয়ই নিলুর মা। খাটো এবং বেশ মোটা। স্বাস্থ্য চেহারায় নিলুর একেবারে বিপরীত। ফর্সা চৌকো চেহারা। বেশ বড় মুখ। কোকড়ানো চুল।

'স্লামালেকুম।' ঢোকার সাথেসাথেই সালাম দিল অঞ্জন।

'ওয়ালেইকুম সালাম। এক্সিডেন্টের কথা শুনলাম বাবা, কোথায় লেগেছে?'

একেবারে শান্ত, নিচু গলার স্বর। যেন বহুদিনের পরিচিত কারো সাথে কথা বলছেন। একবার অঞ্জনের মনে হল তিনি তারচেয়ে বড়জোর বছর পাঁচেকের বড় হতে পারেন, কত সহজে তাকে ছেলের মত করে ডাকলেন।

সে বলল, 'মাথায়।'

'কোথায়, দেখি।'

সামনে এগিয়ে এলেন তিনি। কাছে দাঁড়িয়ে চুলে হাত দিলেন। বোঝা যাচ্ছে খুব সাবধানী। চুলে এতটুকু টান না দিয়ে ফোলা যায়গাটা দেখলেন। মাথার ডানদিকে বেশি ফুলে রয়েছে। লেগেছে সামনের দিকেও।

'আহা-রে কি ফুলে আছে। ব্যথা করে?' আস্তে করে আঙুল বোলালেন তিনি।

'সবসময় করে না। মাঝে মাঝে করে।'

‘ওষুধ খাচ্ছো? একটু ওষুধ লাগিয়ে দিই? ডাক্তার কি বলেছে? শুয়ে বিশ্রাম নাও বাবা। সেলিম বলল বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। সেলিম তো আমার নিজেরই ছেলে। আমার ছেলে নেই, এই একটাই মেয়ে। নাম নীলা। নিলু এদিকে আয় তো। দেখনা চাদরটা ধুলো পড়ে কি হয়ে আছে। ভাল করে ঝেড়ে দে। নয়ত একটা ধোয়া চাদর এনে পেতে দে। আর রুমাকে বল মেঝেটা মুছে দিতে। তুমি বস বাবা। হাতমুখ ধুয়ে নাও। মুখটা কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। আমি দেখি কি খাবার আছে। খেয়ে শুয়ে থাকো।’

নীলা আর তার মা দুজনেই বাইরে চলে গেল। সেলিম এগিয়ে এসে বসল চেয়ার টেনে, ‘আমাকে না জানিয়ে আবার কোথাও চলে যাবেন না। এই যে ফোন আছে দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন। এখানে দরকারী সব জিনিষই পাবেন। যাকিছু কাজে লাগবে নিজের মনে করে ব্যবহার করবেন। আমি ফোনে খোঁজ নেব। এখন কিন' থাকতে পারব না।’
অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হেঁসে ফেলল সেলিম, ‘আমার কিন' খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। মনেহচ্ছে আপনার মত যদি কয়েকদিন সব ভুলে থাকতে পারতাম। কয়েকদিনের স্বাধীনতা। এই টেনশন, দৌড়াদৌড়ি আর ভাল্লাগে না। দেখুন না, যেতে হবে মতিঝিল, কখন যে পৌছাব কখন কাজ শেষ হবে কে জানে। তারপর আবার গাজীপুর। ফ্যাক্টরীর ঝামেলা। আপনি কোনকিছু দরকার হলে নিলুকে বলবেন। ও খুব ভাল মেয়ে। কথা একটু বেশী বলে কিন' একেবারে ছেলেমানুষ। দেখবেন একবার কথা শুরু করলে জোর করে না থামাতে হয়। আমি আর দেরি করিনা, উঠি। রাতে ফোন করব।’
উঠে বাইরে গেল সেলিম। বোঝা যাচ্ছে তার কাজের খুব তাড়া।
অঞ্জন দেখল সেলিম বাড়ির ভেতর ঢুকল। কিছুক্ষন পরই দেখা গেল নিলুর সাথে কথা বলতে বলতে গেটের দিকে এগোচ্ছে। উত্তেজিতভাবে সেলিমকে কি যেন বলছে নিলু। হাতে ভাঁজকরা বিছানার চাদর।

মাথাটা ভারি হয়ে আসছে তার। থাকতে না পেরে ময়লা চাদরের ওপরই শুয়ে পড়ল অঞ্জন।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে কিছুক্ষন ঘুমাল সে। ঘুম ভেঙে যখন দেখল করার কিছু নেই তখন আবার ঘুমাতে চেষ্টা করল। কিন' চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারল না। চুপ করে শুয়ে থাকল বিছানায়। রীতিমত কষ্ট করে বিকেল পর্যন্ত শুয়ে শুয়েই কাটাল অঞ্জন। তারপর একসময় আর থাকতে না পেরে উঠে জামাকাপড় পরে নিয়ে বাইরে পা রাখল।

বাইরে দিনের আলো কমতে শুরু করেছে। বারান্দায় বের হয়ে দেখল নীলা দাঁড়িয়ে আছে। গুনগুন করতে করতে চুলের বেনী করছে। তাকে জামাকাপড় পড়ে ঘর থেকে বের হতে দেখে তাকিয়ে হাঁসল।
অঞ্জন বলল, ‘বাইরে যাব একটু। দরজাটা কি এভাবে থাকবে?’

লক করে চাবি নিয়ে যান।’ বলল নীলা।

সেটাই করল অঞ্জন। ডোরলক লাগিয়ে চাবি পকেটে রাখল।

'চাবি হারাবেন না যেন। আর কোন চাবি নেই।' মনে করিয়ে দিল নীলা।

তারদিকে চেয়ে আরেকবার হেঁসে সম্মতি দিয়ে বের হল অঞ্জন। ভালই হল তার, যে কোন সময় ফিরে সোজা ঘরে ঢুকে যেতে পারবে। এরা একেবারে আপন করে নিয়েছে তাকে। নীলা, নীলার মা দুজনই। এদের বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে না। নীলার বাবা ফেরেননি এখনও। তিনিও এদের মতনই হবেন নিশ্চয়ই। সেলিম বলেছে খুব অমায়িক ভদ্রলোক।

ফেরত আসার পথে বাইরে কোথাও রাতের খাবার খেয়ে নেবে সে। এখলাস সাহেবের দেয়া টাকা রয়েছে পকেটে।

সেলিমের ঘরটা ভাল করে দেখেছে সে। অন্যান্য জিনিষপত্র ছাড়াও টেবিলের ড্রয়ারে অনেকগুলো নগদ টাকা। প্রয়োজন হলে সেখান থেকে খরচ করা যাবে। বেশ লোক সেলিম। রাস্তা থেকে ধরে এনে বাড়িতে রেখে গেল।

নিজেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে এখন। নিজের পরিচিত কেউ নেই একথা মনে হচ্ছেনা। আত্মবিশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো নেই কোন।

আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে আড়ংএর মোড়ে এসে থামল অঞ্জন।

এখন?

কোথায় যাবে সে?

সকলের আগে জানা দরকার সে কে, কোথায় তার বাড়ি, কোথায় তার পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন। তারা কি খুঁজছে তাকে? কতটুকু মনে করতে পারছে সে?

মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সে। কি হয়েছিল হাসপাতালে যাওয়ার আগে?

রেবেকা বলেছে এখলাস সাহেবের মেয়ে আর নাতনীতে বাঁচিয়েছে সে সন্ত্রাসীর হাত থেকে। কি ঘটেছিল সেখানে?

একটা বড় দোকান। সেখানে ছোট্ট একটি মেয়ে। নাম জেসমিন।

তারপরই কি যেন ঘটল।

কি করছিল সে? দোকানে ঢুকেছিল কেন? কিছু কিনতে?

হ্যাঁ, মনে পরছে। ও কিছু কিনতেই ঢুকেছিল। কাকে যেন দেয়ার জন্য। কি কিনতে গিয়েছিল সে? যাকে দিতে চেয়েছিল সে কে? কি সম্পর্ক তার সাথে? সে দেখতে কেমন?

হঠাৎ করেই রেবেকার কথা মনে এল ওর। এই একজনকে সে চিনতে পারবে খুব সহজে। মেয়েটার সাথে আসার সময় দেখা হয়নি। ওর ডিউটি সন্ধ্যায়।

প্রতিদিনই কি সন্ধ্যায় ডিউটি থাকে? তা-তো হবার কথা না। দেখা যাক।

হাসপাতালের দিকে রওনা হল সে।

রিশেপসনের মেয়েটা অবাক হল রেবেকার নাম শুনে। অঞ্জনের মনেহল রেবেকার সাথে কারো দেখা করতে আসা বিরল ঘটনা। অবাক চোখে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

'আমার নাম অঞ্জন। নাম বললেই হবে।'

'ওখানে বসুন জানাচ্ছি।'

সামনে অনেকগুলি চেয়ার রাখা। স্থায়ীভাবে বসানো প্লাষ্টিকের চেয়ার। বেশ কয়েকজন বসে রয়েছে সেখানে। মোটামুটি ফাঁকা একটা যায়গায় বসল সে। ওর বামদিকের দেয়ালে বড় সাদা ঘড়ি টাঙানো। লাফিয়ে লাফিয়ে সেকেন্ডের কাঁটা চলছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল। রেবেকা এল ঠিক আট মিনিট পর।

'কেমন আছেন?'

আবার সেই হাঁসি দেখতে পেল সে।

'ভাল।'

'ব্যথা কি কমেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি-'

এগিয়ে এসে তার চুলে হাত দিল রেবেকা। চুল সরিয়ে ফোলাটার ওপর আস্তে করে আঙুল বুলাল। এভাবে কি ব্যথা আছে কিনা জানা যায়? হয়ত যায় না। ব্যথা সারানো যায়। মুহুর্তে ওর ব্যথা চলে গেল। একটুপরই রেবেকার হাত সরে গেল মাথা থেকে।

'কফি খাবেন? ওদিকে ক্যান্টিনে যেতে হবে।'

কথার অর্থ বুঝল অঞ্জন। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়না। নার্সের পোষাক পরে রেবেকা বসতে পারেনা এখানে।

'চলুন।'

বলে উঠল সে। রেবেকার সাথে হেঁটে এসে ক্যান্টিনে ঢুকল।

ক্যান্টিনটায় আলো কম। অনেক লম্বা ঘর। ঠাসাঠাসি করে চেয়ার পাতা। বেশ কয়েকজন লোক বসে চা খাচ্ছে। ঘরে সিগারেটের গন্ধ। সম্ভবত হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট খাওয়া যায় না বলে এই যায়গাটা একাজে ব্যবহার করা হয়। সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে মেশানো ওষুধ ওষুধ গন্ধ চারিদিকে। ওরা এসে বসতে খুব দ্রুতই কফি দিয়ে গেল। মনেহয় তৈরীই থাকে সবসময়।

কাপ নিয়ে ঠোটে ঠেকাল অঞ্জন। রেবেকা তার কাপটা ধরে নাড়াচাড়া করছে। কথা খুঁজছে।

'হঠাৎ দেখা করতে এলেন যে?' একসময় জিজ্ঞেস করল সে।

অঞ্জন বলল, 'হঠাৎ ইচ্ছে হল। মনে হল এখানে এলে আপনার হাঁসি দেখতে পাব।'

হেঁসে ফেলল রেবেকা, 'ইচ্ছে হলেই কারো হাঁসি দেখতে যান?'

'আর কখনো ইচ্ছে হয়নি।'

‘এখন হল কেন?’

‘জানি না। মনেহয় জীবন বাঁচিয়েছেন সেজন্য।’ বিষয়টা সহজ করার চেষ্টা করল অঞ্জন।

‘এটা কথার কথা।’ বলল রেবেকা, ‘আমি যা করেছি সেটা সব নার্স করে। এটা নার্সের কাজ।’

‘সবাই আপনার মত হাঁসে না। আরেকজন ধমক দিয়েছে।’

‘মনে কষ্ট পেয়েছেন?’ আবার হাঁসছে রেবেকা। ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে। বলল, ‘ওনার ধরনই অমন। একটু গম্ভীর স্বভাবের। আসলে উনি খুব ভাল মানুষ। ধমক দেন না। পেসেন্টের জন্য যা ভাল তাই করতে বলেন। সেজন্য অনেকসময় ধমকও দিতে হয়।’

‘আপনিও ধমক দেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘এখন ধমক দিতে ইচ্ছে করছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেন?’

‘এই যে বোকার মত দেখা করতে এলেন। আমাদের অনেককিছু হিসেব করে চলতে হয়। অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। আমার সাথে কেউ দেখা করতে আসে না।’

‘আসলে ধমক দেন?’

‘আস্তেই না।’

‘কেউ দেখা করতে চাইলে বাসায় যায়?’

হঠাৎ করেই হাঁসি থেমে গেল রেবেকার। উত্তর দিল না। কফির কাপটা নাড়ছে। তাকিয়ে আছে সেদিকে। সামান্য একটু খেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে আর খাবে না। একটু পর মুখ তুলল। নিজেই প্রশ্ন করল এবার।

‘বাড়ির কথা মনে পরেছে?’

‘না।’

‘একটুও না?’

‘না।’

‘উঠেছেন কোথায়?’

‘এক বন্ধুর বাসায়।’

‘তাকে পেলেন কোথায় ?’

‘আমি চিনতে পারিনি। রাস্তায় দেখা হল, বলল আমার বন্ধু। বাসায় নিয়ে গেল। সেখানেই আছি।’

‘টাকাপয়সা আছে চলার মত?’

‘হ্যাঁ, এখলাস সাহেব দিয়েছে।’

‘এখলাস সাহেব আপনার জন্য অনেক করেছেন।’

অবাক হল অঞ্জন। আগেও একবার এখলাস সাহেবের বিষয়ে বলেছে তাকে। হাসপাতালে থাকতে নিষেধ করেছে। মেয়েটা বোকা না মোটেই। এখলাস সাহেব যা করেছেন সেটা তার ঋন। সময়ে ঋন শোধ দিতে হবে।

নাকি অন্য কোন বিষয় রয়েছে এখানে? তার নিশ্চিত হওয়া দরকার।

জিজ্ঞেস করল, 'উনি ঠিক কি কি করেছেন সব আমার মনে নেই। মনে করিয়ে দেবেন?'

আবার হাঁসল রেবেকা, 'উপকারীর উপকার গুনতে হয়না। এটুকু বলছি, আপনাকে পুলিশ হয়রানি করেনি ওনার জন্য। একদিন এসেছিল সেটা তো দেখেছেন। আর সাংবাদিকরা আপনার দেখা পায়নি সেটাও ওনার জন্য। পেলে এভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না। আপনি কি জানেন সবাই আপনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে?'

'কি আলোচনা?'

'আপনি সিনেমার হিরোর মত চারজনকে গুলি করেছেন, নিজের বিপদের কথা না ভেবে এক মহিলা আর তার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন এইসব। আপনার শরীরের যে অবস্থা তাতে লোকজন পথেঘাটে চিনে ফেললে সমস্যায় পরবেন।'

ঝড়ের একটা ঝাপটা লাগল যেন ওর মাথার ভেতর। কনকন করে উঠল মাথাটা। চোখ বন্ধ করল সে। মানুষের মস্তিস্ক বিশ্বের সবচেয়ে জটিল বস'। এরই কোন এক অংশে আঘাত লেগেছে তার। হয়ত অকেজো হয়ে গেছে একটা অংশ। সে যায়গা ব্যবহার করতে গেলেই চোখে অন্ধকার দেখছে সে। মাঝেমাঝেই হচ্ছে এটা।

রেবেকার বুঝতে সময় লাগল না সেটা। কিছু না বললেও সে বুঝতে পারছে অঞ্জনের আরো বিশ্রাম দরকার।

'বাসায় চলে যান। ভাল করে বিশ্রাম নিন। এঅবস্থা বেশিদিন থাকে না। কদিন বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সহানুভুতির স্বরে বলল রেবেকা।

'আপনার বাসা কোথায়?' আবারও জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

চোখ খুলল অঞ্জন। মুখে একেবারেই হাসি নেই এখন রেবেকার। বাড়ির কথা বলতেই হাসি থেমে যাচ্ছে। অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। তবে একেবারে এড়িয়ে গেল না এবার। বলল, 'আমি হোষ্টেলে থাকি। কেউ দেখা করতে গেলে গেট থেকে খবর দিতে হয়। সবসময় দেখা হয় না।'

এটা তথ্য, না উপদেশ, না নির্দেশ? অবাক হল অঞ্জন। দেখা করতে এখানে আসা যাবে না। হোষ্টেলে গেলেও দেখা হবে সে নিশ্চয়তা নেই। এখানে আসায় নিশ্চয়ই খুশী হয়নি। মুখে যত হাসিই থাকুক, বিরক্ত হয়েছে।

'এখানে কফির কাপ কত?' কথা ঘুরাল অঞ্জন।

আবার হাসি ফিরল রেবেকার, 'সে নিয়ে ভাবতে হবে না। এখন আপনি আমার গেষ্ট।'

'আচ্ছা।'

'আমার এখানে আসা পনের মিনিট হয়ে গেছে।'

তারমানে যাওয়ার সময় হয়েছে, ভাবল অঞ্জন। হাতের দিকে তাকাল সে। ঘড়ি নেই। বেল্টের যায়গা অতিরিক্ত সাদা। অভ্যাস বসেই চোখ যাচ্ছে সেদিকে।

'আপনার ঘড়ি কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

'জানি না। মনে হয় কারো পছন্দ হয়েছিল খুলে নিয়েছে। এখলাস সাহেবের মেয়ে কেমন আছে?'

'মনে হয় ভালই। হাতে গুলি লেগেছিল। চারটা ষ্টিচ দিতে হয়েছে। কিছুক্ষন পরই বাসায় চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল অঞ্জন। রেবেকা কোন কথা বলছে না। বোঝা যাচ্ছে সে যেতে চায় নিজের কাজে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় হিসেব করছে। নিজেই বিদায় নিয়ে পথে নামল সে।

এখন কোথায় যাওয়া যায়?

নিজেকে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পেল না অঞ্জন। উদ্দেশ্য ছাড়াই হাঁটতে শুরু করল ও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। রাস্তার দুপাশে দোকানগুলো ঝলমল করছে আলোয়। দেখতে দেখতে হাঁটতে থাকল সে। বেশ লাগছে রাস্তার লোকজন, দোকানপাট দেখতে। একজনও লক্ষ্য করছে না তাকে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। এই ভীড়ের মধ্যে একজন মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে যে তার নিজের নাম জানে না, তার পরিচিত কেউ আদৌ আছে কি-না জানে না, তার ঠিকানা কি জানে না, যে প্রানপনে চেষ্টা করছে তা মনে করতে অথচ চারিদিকে চলেফিরে বেড়ানো কেউ টের পাচ্ছে না সেটা। আগে কখনো এসব কথা তার মনে হয়নি। আজ হঠাৎ করেই সে বুঝল চারিদিকে মানুষ কত বিচিত্র। একজনের কথা আরেকজন জানে না। জানার চেষ্টাও করে না। সবাই নিজেকে নিয়ে চলছে। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজের নিজের আলাদা জগত, পরিচিতজন, নিজের কাজ। এর বাইরে যেতে চায় না কেউই।

অনেকক্ষন ধরে হেঁটে বেরাল সে। এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তা, সেখান থেকে আরেক রাস্তায়। ঘন্টাদুয়েক, কিংবা আরো বেশী। কত সময় কেটে গেল তার কোন হিসেব নেই তার কাছে। হাতে ঘড়ি নেই, কোথাও যাবার তাড়া নেই, কোথাও কোন কাজ নেই, সময়ের কোন হিসেবও নেই। সেলিমের কথামত একবারে স্বাধীন।

রাস্তার লোকজন কমতে শুরু করেছে। অন্তত ও যেখানে হাঁটছে সেখানে। ইচ্ছে করেই ফাঁকা রাস্তায় হাঁটছে সে। শরীর ক্লান্ত হয়ে গেলেও থামল না। ভাল লাগছে হাঁটতে।

এই সময়ের মধ্যে কারো সাথে কোন কথা হয়নি তার। কারো সাথে তার কথা বলা প্রয়োজন হয়নি, রাস্তার কেউ তাকে ডেকে কথা বলেনি। তারপরই একেবারে ফাঁকা রাস্তায় আলোআঁধারী ঘেরা এক যায়গায় ওকে ডাকল একজন, 'এই যে ভাইজান-'

দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখল অঞ্জন। ওকেই ডেকেছে একজন যুবক। ওর চেয়ে ইঞ্চিদুয়েক খাটো হবে। একটু দুরে রাস্তার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। ও থামতে এগিয়ে এল সামনে।

'ভাইজানের কাছে দেশলাই হবে?' জিজ্ঞেস করল তাকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অঞ্জন। উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করল। দেশলাইয়ের জন্য কেউ এভাবে ফাঁকা রাস্তায় অপেক্ষা করে না। একটু দুরে একটা ছোট চায়ের দোকান দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজন হলে সেখানে যেতে পারত। এর উদ্দেশ্য অন্য। তাকে থামিয়েছে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। চারিদিকের পরিস্থিতি দেখছে, তাকে যাচাই করছে। একজন লোক হেঁটে আসছিল অঞ্জনের পিছনে, ওদের দেখে যেন আরো দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল সামনে। এখন কেউ নেই আশেপাশে।

অঞ্জন কোন কথা না বলে অপেক্ষা করছে।

'এইডা দ্যাখছেন।' হাত দিয়ে কোমড়ের কাছটা দেখাল যুবক।

এটাই ধারনা করছিল অঞ্জন। পিস্তল অথবা ছোরা কিছুএকটা রয়েছে সেখানে। ভয় দেখিয়ে কাজ সারতে চাইছে। ওরকাছে যা কিছু আছে দিয়ে দিতে হবে একে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুসি মারল সে ওর বুকের ওপর। এক ঘুসিতে চিৎ হয়ে পরল যুবকটি। ওঠার চেষ্টা করতেই দুপা সামনে এসে আরেকটা কিক করে উল্টে দিল ওকে।

ব্যথা পেয়েছে তবু এতটুকু শব্দ করছে না, চিৎকার করছে না। হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উঠে দাঁড়ানোর আগেই অঞ্জনকে একেবারে হতচকিত করে অন্ধকার থেকে উদয় হল আরেকজন।

'খবরদার নড়বি না।'

অন্ধকারেই অঞ্জন দেখল আগন'কের হাতে পিস্তল। সোজা ধরে আছে পরে থাকা যুবকের মাথার কাছে। পাথরের মুর্তির মত জমে গেল যুবক। আরেকজন বামহাতে দ্রুত হাতড়ে কোমড় থেকে পিস্তল খুলে নিল। সেটাকে নিজের পকেটে গুঁজে বামহাতে যুবকটির ডানহাত মুচড়ে ধরল। টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। এক মোচড় দিতে হাত ভাঁজ হয়ে পিঠের কাছে চলে গেল। এমনিতেই স্বাস্থ্যবান লোকটা। ব্যথায় মুখ কুঁকড়ে গেল যুবকের। এখনও এতটুকু শব্দ করছে না।

পুরো ঘটনা ঘটে গেল যেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

'স্যার কিছু হয়নি তো?'

এবারের প্রশ্ন অঞ্জনকে। রীতিমত চমকে গেল অঞ্জন।

কে এই লোক? তাকে স্যার বলছে কেন?

এটুকু বোঝা যাচ্ছে তাকে বাঁচাতে চায় এই লোক। ওই যুবকের কাছে পিস্তল আছে জেনেই সামনে এসেছে। এখন যুবকটি পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রনে। যুবকের পিস্তল তার পকেটে।

সে স্বাভাবিকভাবে বলল, 'না কিছু হয়নি। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?'

'জ্বি' একটু যেন ইতস্তত করল লোকটা। তারপর বলল, 'আমার নাম সুলতান।'

অঞ্জন ভালভাবে তাকাল তার দিকে। এখন চেহারা দেখা যাচ্ছে। মনে হল একে সে দেখেছে কোথায় যেন। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় সম্ভবত। একটা চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারসাথে চোখাচুখি হওয়ায় চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এমন চেহারা, এমন স্বাস্থ্য সচরাচর দেখা যায় না। ছফুটের মত লম্বা। খেলোয়ারদের মত স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন চেহারা, পরিপাটি চুল। ভালমানুষি ভাব রয়েছে তাতে। অনায়াসে নাটক-সিনেমার নায়ক হতে পারবে।

'আপনাকে হাসপাতালের কাছে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তখন থেকেই পিছু নিয়েছেন নাকি?' মুখে হাঁসি ফুটিয়ে জানতে চাইল অঞ্জন।

'জ্বি স্যার।' অস্বীকার করল না সে।

'ও।'

দ্রুত চিন্তা করছে অঞ্জন। নিঃসন্দেহে পুলিশের লোক। সাধারন পুলিশ না, বিশেষ ট্রেনিং নেয়া। সাধারন পুলিশ এত দক্ষ হয় না, কথাবার্তায় এত ভদ্র হয়না। স্বাস্থ্য চেহারাও এমন হয় না।

কে লাগিয়েছে একে তার পেছনে? এখলাস সাহেব?

একমাত্র তারই সম্ভাবনা দেখতে পেল সে।

যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখল অঞ্জন। গোবেচারার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'এক কাজ করুন সুলতান সাহেব। একে ছেড়ে দিন। পিস্তলটা যায়গামত জমা দেবেন তাহলেই হবে।'

'ছেড়ে দিতে বলছেন স্যার?' অবাক হল সুলতান নামের লোক।

'দিন ছেড়ে। আর মনেহয় এসব করবে না।'

হাত বাড়িয়ে যুবকটির কলার ধরে টান দিল অঞ্জন। সুলতান হাত ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়ে হাত সোজা করার চেষ্টা করছে। ব্যথা পেয়েছে ভালমতই।

অঞ্জন বলল, 'আবার এসব করতে দেখলে ধরে পাবলিকের হাতে দেব। মনে থাকবে? যা ভাগ এখান থেকে।'

নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যুবকটি। তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও চলে যেতে দিচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষন। একবার অঞ্জনকে একবার সুলতানকে দেখল। বোঝা যাচ্ছে যাওয়ার চেষ্টা করলে কেউই বাধা দেবে না।

তারপর ঘুরে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল। ওকে যতক্ষন দেখা যায় তাকিয়ে দেখল, তারপর সুলতানের দিকে ফিরল অঞ্জন।

'তাহলে সুলতান সাহেব, আবার দেখা হবে।'

‘গাড়ি ঠিক করে দেই?’

‘না, হাঁটতে ভাল লাগছে। এবার সাবধানে দেখে শুনে হাঁটব। এখলাস সাহেবকে বলবেন আমাকে পাহারা দেয়া দরকার নেই।’

‘জ্বি স্যার।’

কাজে দক্ষ হলেও সুলতান মানুষটা সরল। নয়ত এতসহজে তার কথায় সায় দিত না। সে এখলাস সাহেবের লাগানো লোক একথা প্রকাশ পেতে দিত না।

আর কথা না বাড়িয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন। সোজা হেঁটে বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে সাবধানে একবার দেখার চেষ্টা করল সুলতান আসছে কি-না। দেখতে পেল না। মনেহয় তার কথা শুনে চলে গেছে।

সামনের দিকে পা বাড়াল সে। এখানে রাস্তার পাশে বড়বড় দোকানে আলো ঝলমল করছে। দেখে কেনাকাটা করার ইচ্ছে হল অঞ্জনের। পকেটে টাকা আছে যথেষ্ট। কয়েকটা দোকানে ঘুরেঘুরে সার্টপ্যান্ট, টুথপেষ্ট, সেভ করার জিনিষপত্র কিনল। রাস্তার ধারে দোকান থেকে খাবার কিনে খেল। একসময় দোকানে ঝুলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বাড়ি যাওয়াই ভাল মনে হল তার। যার বাড়িই হোক, সেখানে যেই থাকুক, সেখানে ফিরতে হবে ওকে।

গেট খোলার শব্দ পেয়ে কাজের মেয়ে বের হল বারান্দায়। দেখে খুশি হল সে। বলল, ‘বল আমি খাব না, বাইরে খেয়ে এসেছি।’

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পরল সে।

ঘুম দরকার তার। মস্তিস্ককে বিশ্রাম দেয়া দরকার। তাহলে মস্তিস্ক সচল হবে। মস্তিস্কের সেই অংশটা আবার কাজ করবে। সব মনে করতে পারবে ও। ওষুধ কেনা হয়নি। ওষুধের নামই মনে নেই। রেবেকাকে জিজ্ঞেস করলে হত। একেবারেই মনে হয়নি সে কথা।

আবার দেখা হলে জেনে নিতে হবে।

কিভাবে আবার দেখা হবে ভেবে পেল না অঞ্জন। রেবেকা হোষ্টেলে থাকে বলেছে কিন' সেটা কোথায় বলেনি। হাসপাতালে দেখা করতে যাওয়া সে পছন্দ করেনি। আবার সেখানে যাওয়া যায় না।

অনেকক্ষন শুয়ে থেকেও ঘুমাতে পারল না অঞ্জন। এপাশ ওপাশ করতে থাকল। শুয়ে থেকে সবকিছু মনে করতে চেষ্টা করল। সেলিম ফোন করতে চেয়েছিল রাতে। কি আলাপ করবে সে?

হয়তো জিজ্ঞেস করবে কোন সমস্যা আছে কিনা। কিছু করার জন্য তৈরী হয়ে আছে সে। কিছু বলার আগেই নিজে থেকে তাকে এনেছে এখানে, থাকার ব্যবস্থা করেছে। একেবারেই অস্বাভাবিক বিষয় যেন সেলিমের কর্মকান্ড। বিপদের সময় এমন মানুষ কজন পাওয়া যায়?

ফোন করতে চেয়েছে নিজেই। এখনও ফোন করেনি। না-কি করেছিল ও বাইরে থাকার সময়?

নিজে থেকে ওকে ফোন করলে কেমন হয়। ফোন করে বলা, ভাল আছি। এতখানি যে করেছে তাকে এটা জানানো কর্তব্য।

সেলিমের নাম্বার কত?

উঠে লাইট জ্বালল অঞ্জন। টেবিলের ওপর সামনেই একটা টেলিফোন ডিরেক্টরী। সেটা খুলে নাম্বার দেখতে শুরু করল। এস দিয়ে লেখা নামগুলিতে সেলিম নাম নেই। খন্দকার হিসেবে লিখলে কে অক্ষর দিয়ে থাকবে। সেখানেও নেই। হয়ত নিজের নাম্বার জন্যই লেখেনি।

বন্ধ করল ডিরেক্টরীটা। আবার খুলল। প্রথম পাতা খুলেই দেখল একেবারে শুরুতে নাম-ঠিকানা লেখার যায়গায় মোটা কলম দিয়ে নাম লেখা। সেলিম খন্দকার। সাথে ঠিকানা এবং একটা ফোন নাম্বার, একটা মোবাইল ফোনের নাম্বার। এই ফোনের নাম্বার না। এটার নাম্বার সেটের সাথে লাগানো। বাড়ির ঠিকানা গাজিপুরের। অন্তত একটা বিষয় নিশ্চিত, সেলিম লোকটা মিথ্যে বলেনি। তার বন্ধু। তার ভাল চায়। একে বিশ্বাস করা যায়।

টেলিফোনটা কাছে টেনে নিয়ে হ্যান্ডসেটটা তুলে কানে লাগাল অঞ্জন। সাথেসাথেই ওপাশ থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল-

'আমি এত সহজে কাউরে ছাড়ি না।'

ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর। সাথে সাথেই খুট করে একটা শব্দ হল। কোন একদিকে কেউ ফোন নামিয়ে রাখল। হয়তো টের পেয়েছে তার ফোন উঠানোর কথা। অঞ্জন কানের সাথে চেপে ধরে রাখল ফোনটা। এখনো শব্দ শোনা যাচ্ছে লাইনে। হয়ত আরেকজন টের পায়নি ফোন রাখার কথা, কিংবা তার ফোন উঠানোর কথা। একটুপর আবার সেই কণ্ঠ শোনা গেল।

'কাইল পাঁচটায় শাহবাগ মোড়ে, মনে থাকে য্যান।'

এবার কেটে গেল লাইনটা। মনে হল রাগের সাথে ফোন রেখে দিল।

হ্যান্ডসেটটা নামিয়ে রাখল অঞ্জন। টেলিফোনের তারের দিকে তাকাল। এখন লাইনে ক্রশ হয় না। সব ডিজিটাল লাইন। তাহলে?

এই লাইনের প্যারালাল লাইন আছে। সম্ভবত ভেতরে নীলাদের কোন ঘরে। কেউ একজন কথা বলছিল সেটা থেকে।

কে কথা বলছিল? নীলা? নীলার বাবা? নীলার মা?

সে ফোন উঠিয়েছে টের পেয়ে রেখে দিয়েছে সাথেসাথে।

নীলার বাবার সাথে এখনো দেখা হয়নি। নীলা আর নীলার মার চেহারা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। এধরনের আলোচনা বেনামান দুজনের জন্যই। দুজনকে দেখে একেবারে বিপরীত মনে হলেও এই বিষয়ে দুজন একই রকম। কেউ উটকো ঝামেলায় জড়াবে না।

কে তাহলে? নীলার বাবা?

ওদিকের লোকটার কথা বলার ধরন ভাল না। মনেহল হুমকি দিচ্ছে। তার কথা না শুনলে ক্ষতি করবে। কণ্ঠস্বর শুনে বয়স কত আন্দাজ করা যায় না। গলায় কোন সমস্যা আছে। যুবক হতে পারে, বয়স্কও হতে পারে। ঢাকাই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। নীলারা এভাষায় কথা বলে না।

কে সে? কি চায়?

আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় শাহবাগ মোড়ে তারকাছে কিছু পৌছে দিতে বলেছে সে। না দিলে সে ক্ষতি করবে।

নাকি দেখা করতে বলেছে সেখানে?

এসে শুয়ে পরল সে।

কল কি এদিক থেকে করা হয়েছে না ওদিক থেকে। বাইরে থেকে কল এলে এখানেও রিং বাজার কথা। বাজেনি কেন?

উঠে আবার ফোনটা দেখল অঞ্জন। রিঙার অফ করা। রিং হলেও শোনা যাবে না। মনেহয় সেলিম থাকলে তখনই শুধু অন করা থাকে। সেটাই ভাল মনে হল তার। তারকাছে ফোন করবে কে?

আবার এসে শুয়ে পরল সে। সেলিম যদি তাকে ফোন করেই থাকে তাহলে জানাবে কেউ। শুয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করল সে।

একটা ঘোরের মধ্যে রাত কাটল অঞ্জনের। দুঃস্বপ্ন দেখল। একবার দেখল একজনকে কুকুর কামড়েছে। কামড় খেয়ে সে কুকুরের মত শব্দ করছে। সে আবার কাকে কামড়াল। সেও তারমত হয়ে গেল। আবার দেখল একটা কুকুর মানুষের মত কথা বলছে। তারপর দেখল মানুষ কুকুর আর কুকুর মানুষের দুটো দল। মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য তৈরী। তারপরই দেখল ও ছোটবেলায় ফিরে গেছে। একটা বাড়ির উঠানে দৌড়াচ্ছে সে। পাশেই কিসের যেন কারখানা। লোহার কারখানা। পিস্তল তৈরী হচ্ছে সেখানে।

ঘুম ভেঙেও ওর মনে হল এটা যেন স্বপ্ন না, বাস্তব। এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে ও বাস করছে। বন্ধু কে, শত্রু কে, সে জানে না। যাদের সাথে সে চলছে তাদের কারো সম্পর্কেই সে জানে না ভাল করে। এদের কার উদ্দেশ্য কি সে জানে না। হয়তো বিশ্বাস করা উচিত হবে না কাউকেই। এখলাস সাহেবকে না, সেলিমকে না, নীলার বাবাকে না, কাউকেই না। কার মনে কি আছে জানে না সে।

অথচ এই মানুষগুলোই তাকে ঘিরে রেখেছে চারিদিক থেকে। এখান থেকে সরে অন্য কোথাও যাওয়ার মত যায়গা তার নেই।

সকালে উঠে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে বাইরে যাওয়ার প্রস'তি নিল অঞ্জন। কোথায় যাবে জানা নেই, তবু যেতে হবে। এই রহস্য ভেদ করতেই হবে তাকে। তার নিজের পরিচয় বের করতে হবে।

তৈরি হয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখল নীলা দাঁড়িয়ে। তাকে বলল, 'নিলু, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

অবাক হওয়া চেহারা দেখা গেল নীলার। বলল, 'নাস্তা করে যান। খাবার হয়ে গেছে।'

'এখন সময় নেই। বাইরে কিছু খেয়ে নেব।' বলেই যাওয়ার জন্য পা বাড়াল অঞ্জন।

আরো অবাক হয়ে চেয়ে থাকল নীলা। তবে প্রতিবাদ করল না। তার কথা মেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরবেন কখন?'

'দুপুরের মধ্যেই।'

'আবার বাইরে খেয়ে আসবেন না। এখানে খাবেন।'

'আচ্ছা।'

মেয়েটা একেবারেই সরলসোজা। একজন অপরিচিত মানুষকে এক কথায় একেবারে আপনজন হিসেবে মেনে নিয়েছে। সেলিম বলেছে তার পরিচিত, শুধুমাত্র সেই কথায় ভর করে।

বারান্দার নিচে পা রাখল অঞ্জন।

বাইরে বের হয়ে অনেকক্ষন রাস্তায় ঘুরল অঞ্জন। আরেকবার ঝালাই করল ওর পরিচিত মানুষজনকে। রেবেকাকে চেনে সে। হাসপাতাল চেনে। রেবেকার হোস্টেলের ঠিকানা জানে না। এখলাস সাহেবকে চেনে। তার বাড়ির ঠিকানা রয়েছে, ফোন নাম্বার রয়েছে। ইচ্ছে করলে সেখানে যোগাযোগ করা যায়। সেলিমের নাম্বার জানে। ঠিকানা জানে, ফোন নাম্বার জানে। সে থাকে গাজীপুর। ঢাকার বাইরে। আর?

আর কাউকেই চেনে না সে। এমন কোন যায়গা নেই যেখানে সে যেতে পারে।

কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকল সে। রাস্তার সাইনবোর্ড দেখতে থাকল। এদের কোনকিছু দেখে সে মনে করতে পারবে সবকিছু। কোন দোকান দেখে মনে হবে সেটা পরিচিত। কোন বাড়ি দেখে মনে হবে সেটাই তার বাড়ি। কোন যায়গা দেখে মনে হবে সেখানে ঘটেছে কোন ঘটনা। সে মনে করতে পারবে তার অতীত, বের করতে পারবে নিজের পরিচয়।

বেলা বাড়ার সাথেসাথে রোদ বেড়ে উঠছে। সেইসাথে রাস্তার ভীড়। এখন রাস্তায় হাঁটতে গেলে ধাক্কা লাগছে এর ওর সাথে। লোকজন অফিসে যাচ্ছে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে কতরকম দোকান বসেছে। রাস্তার অর্ধেক দখল করে রেখেছে ওরাই। ফুটপাত

বলে কিছুই নেই। মুল রাস্তায় এখানে সেখানে গাড়ি থামানো। সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে কোনমতে চলছে গাড়ি, রিক্সা, বাস। চারিদিকে মানুষের হৈচৈ, চিৎকার।

অনেকক্ষন ঘোরার পর ওর খাবার কথা মনে হল। এখন পর্যন্ত কিছু খায়নি সে। একবারও খাবার কথা মনে হয়নি। খিদেও যেন কমে গেছে একেবারে। হোটেলের সামনে কি কি পাওয়া যায় লেখা দেখে একটা হোটেলে ঢুকল। এককোনে বসে মাংশ দিয়ে রুটি খেয়ে নিল। বেশ চালু হোটেল। ঠাসাঠাসি করে চেয়ার বসানো। তারপরও যায়গার তুলনায় ভীড় বেশি। ইচ্ছে হলেও খাওয়ার পর বসে থাকা যাবে না।

তাড়াতাড়ি নাস্তা করে চা খেয়ে বাইরে এসে দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরাল। তখনই চোখ পরল লোকটার ওপর।

হোটেলে ঢোকার আগেও দেখেছে সে লোকটাকে। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার ওপারে একটা পানের দোকানের কাছে। তার আগে আরেকবার দেখেছে রাস্তায় কোথায় যেন।

নজর রাখছে ওর ওপর?

হতে পারে। সুলতানকে চিনে ফেলেছে সে। তাকে জানিয়ে দিয়েছে তার পেছনে ঘোরার প্রয়োজন নেই। তার বদলে হয়ত একে লাগানো হয়েছে। এ বরং নজর রাখার জন্য বেশী উপযোগী। সুলতানের যেমন স্বাস্থ্য চেহারায় চোখেপরা ভাব আছে এর সেটা নেই। বরং সুলতানের একেবারে বিপরীত। বেশ মোটা। মাথায় টাক। মুখে খোঁচাখোঁচা দাঁড়ি। একেবারে সাধারন পোষাক। অনায়াসে রাস্তার লোকের মধ্যে মিশে যেতে পারবে।

মনে হয় পান খায়। পানের পিক ফেলল। সাথেসাথে কর্তব্য ঠিক করে ফেলল অঞ্জন। আর কিছু যখন করার নেই তখন একেই একটু খেলানো যাক। দেখা যাক এর ধৈর্য্য কতটুকু।

রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করল সে। ফুটপাতের দোকানের জিনিষপত্র দেখতে লাগল অকারনে। কিছু জিনিষ দরদাম করল। এমন দাম বলল যেটা শুনলে দোকানদারের গালি দেয়ার কথা। তারপরও অবাক হয়ে দেখল দোকানদার একজোড়া সুন্দর মোজা দিয়ে দিল পাঁচ টাকায়। এরপর আরো কম বলতে হবে, মনেমনে বলে সে মোজাজোড়া পকেটে রাখল। একটা ছোট দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আবারো চা খেল। আরেকটা সিগারেট ধরাল। তারপর শুধুশুধুই হাঁটতে থাকল এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায়। ওই লোকটা কি ভাবছে মনে করে হাঁসি পেল অঞ্জনের। যে স্বাস্থ্য ওই লোকের, এভাবে হাঁটতে থাকলে হাঁটার ভয়েই কেটে পরবে।

কড়া রোদের মধ্যে ঘন্টাখানেক অনবরত হাঁটার পর সামনে একটা সেলুন দেখে ঢুকল সেখানে। বের হওয়ার আগেই সেভ করেছে। চুল এখনও কাটার মত বড় হয়নি, তাহলেও একটু সাইজ করে নেয়া যাবে। কিছুটা সময় কাটানো যাবে। প্রথমেই মনে করিয়ে দিতে হবে ওর মাথায় আঘাত। সে যায়গা বাঁচিয়ে কাজ করতে হবে।

সেলুনটা একেবারে রাস্তার ধারে। বাইরের দিক কাঁচ দিয়ে ঘেরা। চেয়ারে বসে সে আয়নায় দেখার চেষ্টা করল লোকটাকে। রাস্তা দেখা যাচ্ছে, লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না।

মনেহয় কোথায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্তত সেলুনে যখন ঢুকেছে তখন কিছুটা সময় থাকবে এটাই ধরে নিয়েছে হয়ত।

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করল অঞ্জন। একজন লোক খুব মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পরছে। রেবেকা বলেছিল সবাই বলাবলি করছে ওর কথা। সাংবাদিকরা খুঁজছে ওকে। এখলাস সাহেবের অফিসের বাইরে ভীড় করেছিল ওর জন্য। তারপরই বোধহয় ওর ঠিকানা হারিয়ে ফেরেছে ওরা।

দেখতে হবে কাগজে কি লিখেছে। বসে থেকেই ও দেখতে পেল ঘরের এককোনে পুরনো কাগজ জমা করা। অন্তত এক সপ্তার কাগজ পাওয়া যাবে এখানেই।

চুলকাটা শেষে একশ টাকার নোট দিল সে। বলল বাকিটা রেখে দিতে। পুরনো কাগজ পড়বে শুনে লোকটা দাঁত বের করে হাঁসল। নিজেই সেগুলো বের করে ধুলো ঝেড়ে দিল। কাগজগুলি নিয়ে সোফার এককোনে বসল অঞ্জন। কাগজের লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল।

বড়বাজার নামে এক ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরে সন্ত্রাসীদের সাথে সংঘর্ষ দিয়ে শুরু। চারজন মুখোসপরা সন্ত্রাসী গোয়েন্দা কর্মকর্তার মেয়ে এবং নাতনীতে অপহরনের চেষ্টা করে ব্যর্থ। একজন যুবকের সাথে তাদের গুলিবিনিময়। চারজন সন্ত্রাসী ঘটনাস'লে নিহত, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে পলাতক। যুবকটিকে মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় পুলিশের তত্বাবধানে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুল খবর এটুকুই। এরপর বিভিন্নজনের বিভিন্নরকম মন্তব্য। সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, জোর তদন্ত চলছে, এতে বিদেশীদের মদদ থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, পুলিশ জনগনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, জননিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে, গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিজেই হুমকির মুখে, যুবকের কাছ থেকে গুরুত্বপুর্ন তথ্য উদ্ধার এইসব। পুরনো কাগজগুলি দেখা শেষ করে নতুন কাগজে হাত দিল অঞ্জন। সেই যুবকের পরিনতি সম্পর্কে কি লিখেছে খুঁজল।

সে কে, কোথায় কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে সরাসরি কিছু লেখেনি। যা লিখেছে তার অর্থ তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে বুঝানো হতে পারে, বাহবা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাও বুঝানো হতে পারে আবার সে মরনাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে তাও হতে পারে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আরো ছাপা হবে।

যুবকের কাছ থেকে পুলিশ গুরুত্বপুর্ন তথ্য পেয়েছে, অবাক হল অঞ্জন। সে নিজেই যদি সেই যুবক হয় তাহলে সে কোন গুরুত্বপুর্ন তথ্য দিল পুলিশকে? পুলিশের সাথে অবশ্যই কথা হয়েছে তার। রেবেকা ধমক দিয়ে বিদেয় করেছে সেই পুলিশ অফিসারকে। মনে হতেই হাঁসি পেল তার।

মনে মনে আরেকবার ধন্যবাদ দিল সে এখলাস সাহেবকে। সত্যিই তার সৌভাগ্য সাংবাদিকরা তাকে দেখার সুযোগ পায়নি। পেলে তাকে রাস্তায় বের হতে হত না।

সেলুন থেকে বের হল অঞ্জন। একটু একটু করে পরিস্কার হচ্ছে সবকিছু তার কাছে। সে কোনভাবে জড়িয়ে পরেছে এক সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে। তার গুলিতে মারা গেছে চারজন। ঘটনা ঘটেছে বড়বাজার নামে একটা দোকানে। ঠিক কি ঘটেছিল সে ভুলে গেছে। এমনকি নিজের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত মনে নেই তার। তাকে পুলিশ আটকে রাখেনি, অথবা রাখতে পারেনি, কিন' পিছনে লোক লেগে রয়েছে।

লোকটির কথা মনে হতেই সাবধানে চারিদিক দেখল অঞ্জন। হ্যাঁ আছে। এখনো লেগে রয়েছে তার পেছনে একেবারে আঠার মত। দুরে একটা লেপতোসকের দোকানের পাশে বেঞ্চে বসে রয়েছে।

একে ছাড়ানো দরকার।

আবার কিছুক্ষন হাঁটল অঞ্জন। অকারনেই ফুটপাতের দোকানের জিনিষ দরদাম করল। তারপর ধীরেসুসে' একটা বড় জুতার দোকানে ঢুকল। ও দেখেছে দোকানটা অনেক লম্বা, দুইদিকে দুই দরজা। জুতা দেখতে দেখতে কাঁচের ভেতর দিয়ে আড়চোখে দেখল লোকটাকে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে তার বের হওয়ার অপেক্ষা করছে। একটা ল্যাম্পপোষ্টে হেলান দিয়ে অলস ভাবে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

দোকানের অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল অঞ্জন। দ্রুত হেঁটে অন্য রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। একসময় সে নিশ্চিত হল লোকটা আসছে না। তার বের হয়ে যাওয়ার কথা সাথেসাথে টের পাবে না ওই লোক। সে পালিয়েছে বুঝতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে সে চলে যাবে তার নাগালের বাইরে।

একটা রিক্সা নিয়ে বাড়ি রওনা হল সে।

দুপুরের খাবার টেবিলে বসে অঞ্জনের মনে হল তারজন্য বিশেষভাবে আয়োজন করেছে এরা। নানারকম শাকসব্জি, ছোট-বড় মাছ, মাংশ। নীলার মা পাশে বসে খাবার তুলে দিলেন। আপত্তি করেও থামানো গেল না তাকে। একটু একটু করে খেয়ে একসময় পেট ভারী হয়ে গেল তার। ঘরে এসে শুয়ে পরল।

দুপুরে ঘুমিয়ে অভ্যাস নেই তার। বেশ কিছুক্ষন এপাশ ওপাশ করে সময় কাটাল। শুয়ে থাকল অনেকক্ষন, কিছুক্ষন টিভি দেখল। তারপর বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল। কয়েকটা সিগারেট শেষ করল। তারপরও সময় কাটছে না দেখে উঠে সেলফ থেকে বই বাঁছল। সবধরনের বই পড়ে সেলিম। একটা উপন্যাস বের করে বিছানায় শুয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল। অল্প সময়েই ডুবে গেল তার মধ্যে।

কতক্ষন এভাবে কেটে গেছে জানা নেই ওর, একসময় শুনল কে যেন টোকা দিল দরজায়। তাকিয়ে দেখল পর্দার নিচে পা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে নীলা। হাতের বইটা ভাঁজ

করল অঞ্জন। তারপরই উঠে বসল। বইয়ের ফাঁকে আঙুল রেখে বালিশটা টেনে হেলান দিয়ে বসল সে।

হ্যাঁ, নীলাই। কেশে গলা পরিস্কার করল। তারপর পর্দা সরিয়ে মাথা ঢুকাল।

'কি করছেন?'

'কিছু না, এমনি শুয়ে আছি। এস, ভেতরে এস।'

নীলা ঘরে ঢুকে বলল, 'আপনার সাথে কথা বলতে এলাম। সারাদিন কোথায় কোথায় যে থাকেন।'

এগিয়ে এসে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল নীলা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে নতুন কোন ঘরে ঢুকেছে। ঘরে সিগারেটের গন্ধ। টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট রাখা। সেটা দেখল তাকিয়ে। মনেহয় সিগারেটের গন্ধ পছন্দ করছে না। সেলিম হয়ত খায় না।

বইটা বন্ধ করে টেবিলে রাখল অঞ্জন।

'বস। তোমার স্কুল কি খোলা?' জিজ্ঞেস করল নীলাকে।

'স্কুল না, কলেজ।'

'ও আচ্ছা।'

হেঁসে ফেলল অঞ্জন। নীলার গলার স্বর একেবারেই ছোট মানুষের মত। সুরেলা। হঠাৎ করেই অন্য কথায় গেল সে। সোজা অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। ধানসিড়ি নদী কোথায় আপনি জানেন?'

'ধানসিড়ি?'

'হাঁ, ধানসিড়ি। ওই যে, জীবনানন্দের কবিতা। আবার আসিব ফিরে, ধানসিড়িটির তীরে। ওটা তো নদীই? নদীরই তো তীর হয়, না-কি অন্যকিছুর হয়। দাঁড়ান, আমি বসি আপনি চিন্তা করে বলুন।'

চেয়ার টেনে ঘরের মাঝখানে নিয়ে বসল নীলা।

কথা বলতেই এসেছে, ধারনা করল অঞ্জন। মনেহয় নিয়মিত কবিতা পড়ে। জীবনানন্দের ভক্ত। চেয়ারে বসে দুহাতলে কনুই ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে উত্তরের অপেক্ষা করছে।

অঞ্জন বলল, 'জানিনাতো কোথায়। জীবনানন্দের বাড়ি কোথায়?'

'জীবনানন্দের বাড়ি বরিশাল। বরিশালে এই নামে কোন নদী নেই আমি জানি। আচ্ছা এটা পারলেন না। আরেকটা বলুন তাহলে, গৌরি নদী কোথায়?'

অবাক হল অঞ্জন, 'গৌরি নদী? নাম শুনিনি। গৌরনদী নামে একটা যায়গা আছে কোথায় যেন।'

নীলা বিরক্ত হল শুনে। বলল, 'সেই গৌরনদী না। গৌ-রি নদী। পদ্মা মেঘনা গৌ-রি যমুনা বহমান, সেই গৌরিনদী। বলুন কোথায়?'

হার মানতে হল অঞ্জনকে। বলল, 'বলতে পারি না।'

অদ্ভুত ধরনের হাঁসি দেখা গেল নীলার চোখে মুখে। হাসতে হাসতে বলল, 'এটাও পারলেন না। আচ্ছা, তাহলে সহজ একটা ধরি। বলুন নীলাঞ্জন মানে কি? এটা তো জানেন?'

অঞ্জন বলল, 'নীলাঞ্জন মানে- নীল রঙের চোখ। কারো চোখ যদি নীল রঙের হয় তাকে নীলাঞ্জন বলে। মেয়ে হলে বলে নীলাঞ্জনা।'

'হ্যাঁ, পাশ করেছেন। আবার অন্য মানেও হয়। নীলা আর অঞ্জন একসাথে নীলাঞ্জন। আচ্ছা এবার তাহলে বলুন, আমাদের সেই তাহার নামটি অঞ্জনা, কার লেখা?'

'কবিতা?'

'হ্যাঁ, কবিতা।'

'জানি না। মনে পড়ছে না।'

'এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাও ভুলে গেছেন-' এবার শব্দ করে হাঁসতে শুরু করল নীলা।

'আচ্ছা দাড়াও দাড়াও। আমাদের সেই নদীর নামটি- না কি যেন- লাইনটা ঠিক বলেছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছি।' মুখে হাঁসি লেগে রয়েছে নীলার, 'আমার ভুল হয় না। একবার যা শুনি সারাজীবন মনে থাকে। মনে করছেন আমি বেশি বেশি কথা বলছি? মোটেই না। আমি একটুও বেশি কথা বলি না। আমার এক বান্ধবী আছে, তনিমা ওর নাম, ওকে যদি দেখেন তাহলে বুঝবেন বেশি কথা কাকে বলে। ওকে যদি জিজ্ঞেস করেন সকালে কি খেয়েছ তার উত্তর দিতে লাগবে দুঘন্টা। কখন ঘুম ভাঙল, কোনদিকে তাকাল, কি দেখল, উঠে স্যান্ডেল কি কি পায়ে দিল, কয়পা হাঁটল সব ফিরিস্তি দেবে। মানুষ এত কথা বলতে পারে! বাবারে বাবা। সারাক্ষন মুখ চলছে তো চলছেই, বকবক বকবক। মনে হয় ওর শুধু মুখই আছে, নাক কান চোখ কিচ্ছু নেই। না-না আছে। ইয়া বড় বড় কান, দেখে ভয় লাগে। জানেন, তাও-ও শুনতে পায় না। এক কথা তিনবার বলতে হয়। কানের কাছে চিৎকার করলেও বলে, কি বললি? তুই কি কিছু বলেছিস? একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কোকিল কোন মাসে ডাকে রে? আমি বললাম বসন্তকালে। শুনেছেন- আমি বলেছি বসন্তকালে, ও শুনেছে বর্ষাকালে। তাই হয় কখনো? কোকিল কি প্যাঁচা যে বর্ষাকালে ডাকবে? ও তা-ও বলবে। মা বলে তনিমা আসলে ওর মুখে খাবার দিয়ে রাখবি। ও খাবার মুখে দিয়েও কথা বলে। সারাক্ষন খায়, তারপরও আমার চেয়ে রোগা। আচ্ছা, আমার চেয়ে রোগা হলে দেখতে কেমন লাগবে বলুন তো? কার্টুনের মত লাগবে না? ওকে ঠিক কার্টুনের মত লাগে। আমি ঠিক করেছি ওকে দিয়ে একটা কার্টুন বানাব। ভাল হবে না? পারলেন না তো বলতে। ও, আপনি তো ওকে দেখেনইনি। আচ্ছা কালই ওকে নিয়ে আসব। দেখবেন আপনার এমন কান ঝালাপালা করবে, আপনি ভয়ে দৌড় দিয়ে পালাবেন।'

হেঁসে ফেলল অঞ্জন। সেলিম বলেছিল কথা বলতে শুরু করলে জোর করে থামাতে হয়। অঞ্জনের মজা লাগছে শুনতে। কোন জড়তা নেই, একেবারে স্বচ্ছন্দ। একবারও মনে করছে না কিছুই জানে না তার সম্পর্কে। যে নামে তাকে চেনে সেটাও তার নাম না। অন্য একজনের নাম সে ব্যবহার করছে।

একে নিরাশ করতে মন সায় দিল না অঞ্জনের। মনের দিক থেকে এখনও একেবারেই ছোটমানুষ। যা বলছে তাতে সায় দিয়ে গেল সে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভয়ে দৌড় দাও?'

নীলা আগের ভঙ্গিতে কথা চালিয়ে গেল, 'না। আমি কি ভয় পাই? আমি ভয় পাই না। আমার অনেক সাহস। একদিন নিতু আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। রাতের বেলা- কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বলে, কেঁ-রেঁ ওঁখানে? আমি ভয় পাইনি। প্রথমে একটু পেয়েছিলাম, তখন চিনতে পারিনি তো, তাই। চিনতে পেরে গায়ে পানি ঢেলে দিয়েছি। আসলে কিন' ও নিজেই আস্ত ভিতু। বাইরে কোথাও গেলে বলে সাথে চল না ভাই, একা যেতে ভয় লাগে। আমাকে বলে ভাই। কোন মেয়ে কি ভাই হয় কখনো? হয় না। ও তা-ও বলবে, এমন বোকা।'

'আমিও কিন' বোকা।' বলল অঞ্জন।

'আপনি বোকা!' বিস্ময়ে হা হয়ে গেল নীলার মুখ।

'হ্যাঁ, আমি খুব বোকা।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল নীলা। কয়েক মুহূর্ত কথা যোগাল না মুখে। তারপর একসময় মেনে নিল অঞ্জনের কথা।

'তা-ও স্বীকার করলেন।' চেয়ারের ওপর নড়েচড়ে ভাল করে পা মুড়ে বসল নীলা, 'সবাই স্বীকার করে না। বোকা হলেও চালাক সেজে থাকে। আর চালাক বোকা সেজে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, বোকা হলে কোন অসুবিধে নেই। বোকারা ভালমানুষ হয়। যে যত বোকা সে তত ভাল। যার যত বুদ্ধি সে তত খারাপ। বুদ্ধি খাটিয়ে খাটিয়ে খারাপ কাজ করে।'

'তোমার মা কি করছে?' অন্য প্রসংগে যেতে চাইল অঞ্জন।

'মা? মা'র আবার কাজ কি? মা'র কোন কাজ নেই। শুধু একটাই কাজ, নিলু পড়তে বস, নিলু টিভি বন্ধ কর, নিলু ওঘরে যাও। সারাক্ষন এই নিয়েই আছে। এইযে এখানে বসে একটু বলছি এখনই শুনতে পাবেন- নিলু পড়তে যাও। পড়া তো-না যেন ওষুধ খাওয়া। ঘন্টা হিসেব করে গিলতে হবে। বেশী বেশী ওষুধ খেলে কি তাড়াতাড়ি অসুখ সারে? সারে না। আরো নতুন নতুন অসুখ হয়। মা কিন' শুনবে না। নিজে যা বোঝে তাই বলবে। কিছু বললে বলে খাওয়া বন্ধ। নিজেও খাবে না কাউকে খেতেও দেবে না। মা-ও আপনার মত বোকা। আমার মা-তো, বোকা না হয়ে কি পারে! আমি কিন' অত বোকা না। আমার অনেক বুদ্ধি। মাঝে মাঝে এমন চালাকি করি, আমি নিজেই চমকে যাই। মনে মনে ভাবি, কে-যে বুদ্ধি দিল। তারপর বলি, কই কেউ দেয়নি তো। এটা আমার নিজেরই বুদ্ধি। হি-হি। আপনার এমন হয়?'

'না।'

'সবার হয় না। একজন আরেকজনের মত হয় না। সবাই আলাদা আলাদা। ঠিক বলেছি না?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।'

‘জানেন আমাকে কোথাও যেতে দেয় না। বলে ক্লাশ শেষ হলে সোজা বাড়ি। কোথাও যেতে পারবি না। সারাদিন কি বাড়িতে বসে থাকা যায়?’

‘তোমার বাবার সাথে যাবে।’

‘বাবা! বাবা সকালে যায় রাতে আসে। আমি কি রাতে বেড়াতে যাব? রাতে কেউ বেড়াতে যায়? যায় না। সেলিম ভাই যখন আসে তখন সেলিম ভাইয়ের সাথে বাইরে যাই। ঘুরে ঘুরে পছন্দমত জিনিষ কিনি।’

অঞ্জনের একবার মনে হল হয়ত বেড়াতে যেতে চাইছে তারসাথে। একা যেতে দেয় না, সে সাথে থাকলে যেতে দেবে। সে বলল, ’আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব না হয়।’

‘যাবেন? আচ্ছা, মাকে বলব। মা আবার সব যায়গায় যেতে দেয় না। একদিন সেলিম ভাই বলেছে হাত দেখাতে যাবে, জ্যোতিষীর কাছে। মা বলে, কক্ষনো না। ওসব লোকের কাছে যেতে হয় না। সব ভন্ডামি। কাউকে হাত দেখাতে হয় না।’

একটু থেমে অঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষন। তারপর আচমকাই প্রশ্ন করল, ‘আপনি হাত দেখতে পারেন?’

‘হ্যাঁ। কিন' হাত দেখে কিছু বলতে পারি না।’

‘এ্যাঁ, সেটা আবার কেমন হাত দেখা?’

‘এই যে হাতের দিকে তাকালেই হাত দেখা যায়।’ নিজের হাত ঘুরিয়ে দেখাল অঞ্জন।

অঞ্জনের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকল নীলা। বেশ সময় লাগল কথাটা বুঝতে। তারপর বলল, ‘ও বুঝেছি। আপনি ভাল রঙ্গ করতে পারেন। আমাদের এক স্যারও পারে। একদিন আমি চুলে রঙ করে গেছি। এখানে, একটু বাদামী রঙ। আমাকে বলে নীল রঙ দিলে ভাল হত। আমার নাম নীলা তো তাই। আচ্ছা, এটা কি ঠিক? স্যার হয়ে ক্লাশে চুলের দিকে তাকাবে কেন? সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে বল তো কার চুল নীল। তার আমি কি জানি? আপনি নীল চুলঅলা কাউকে দেখেছেন? দেখেননি। নীল রঙের চুল হয় না। আমি আর কোনদিন রঙ দেইনি। অন্যরা কিন' দেয়। ওদের কিছু বলে না। শুধুশুধু আমাকে কথা শোনাল। তারপর একদিন নতুন একটা জামা গায়ে দিয়ে গেছি। সিংগাপুর থেকে আনা, একটু বড় হয়েছে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে কাকতাড়-য়া। ক্লাশে তিনবার বলেছে। অন্যরা বুঝতে পারেনি কাকে বলেছে, আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও কমপ্লেন করেছি। পরে আমাকে বলে কি- চল চাইনিজ খেয়ে আসি। যেন বললেই আমি যাব। সবাই যায় তো। বন্ধুদের নিয়ে চাইনিজ খেতে যায়। . . . . আপনার মেয়েবন্ধু আছে?’

‘না।’

‘থাকবেও না। কথা বললে যারা হুঁহ্যাঁ-টুঁট্যা করে উত্তর দেয় তাদের মেয়েবন্ধু থাকে না। মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করলে কথায় সায় দিতে হয়। কথায় কথায় বলতে হয় আচ্ছা, তাই নাকি, বেশ তো, খুব ভাল তো এইসব। আপনিতো এসব কথা জানেনই না। আচ্ছা আপনাকে তানিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। দেখবেন দুদিনে আপনাকে সব শিখিয়ে দেবে। ওর যে কত বন্ধু গুনে শেষ করতে পারবেন না। না-না তানিয়া হবে না। আপনি ওর

সাথে পারবেন না। ও সাংঘাতিক চালাক। তাহলে শিরীন। জানেন শিরীন কবিতা লেখে। লিখে কাউকে দেখায় না, শুধু আমাকে দেখায়। একবার পত্রিকা অফিসে পাঠিয়েছিল, ওরা কোন উত্তর দেয়নি। ও বলে কি- ওরা ওর কবিতা বুঝতেই পারেনি। নয়তো রেখে দিয়েছে পরে নিজেদের নামে ছাপবে। ও সবকিছু নিয়ে কবিতা লিখতে পারে। আপনাকে দেখলে আপনাকে নিয়েও লিখবে। আপনি দেখবেন ওর কবিতা?'

'হুঁ, দেখব একসময়।'

'একসময়টা আবার কি? এখনই দেখাই। আমার আবার ভুলোমন, কখন একদম ভুলে যাই। দাঁড়ান নিয়ে আসি। চা খাবেন? তাহলে চা-ও নিয়ে আসি। চা না খেলে আমি কথা বলতে পারি না। আমি এক্ষুনি বানিয়ে আনছি। তিন মিনিট।'

উঠে স্যান্ডেল পায়ে দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নীলা।

সাথেসাথে উঠে দ্রুত জামাকাপড় পরে তৈরী হল অঞ্জন। এরমধ্যে চা এসে গেলে সেটা খেয়েই বের হতে হবে। পাঁচটার আগে শাহবাগ পৌছাতে হবে। সে দেখবে কে পাঁচটায় আসে সেখানে।

আর যেই হোক অন্তত নীলা না। সে পাঁচটায় শাহবাগে কারো কথা রাখতে যাচ্ছে না।

পাঁচটা বাজার দুমিনিট পর বাস থেকে নামল অঞ্জন। শাহবাগ মোড়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের কাজকে একেবারেই বোকামী মনে হল তার। পাঁচটার সময় শাহবাগে কেউ কারো সাথে দেখা করবে, এটুকুই জানে সে। কে দেখা করবে, কারসাথে দেখা করবে, জানে না। দুপক্ষের কাউকেই চেনে না। তাহলে এখানে কি করার আছে তার?

এখনো নীলার বাবার সাথে তার দেখা হয়নি। অবশ্য ছবি দেখেছে ঘরে, তাহলেও চিনতে পারবে এমন নিশ্চয়তা নেই। অনেক পুরনো ছবি টাঙানো ছিল ঘরে। আর শাহবাগে কোথায় দেখা করবে তাও জানে না সে। নিশ্চয়ই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না তার মত।

মোড়ে ফলের দোকানগুলোর কাছ দিয়ে কিছুক্ষন হাঁটাহাটি করল সে। চা খেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হেঁটেহেঁটে জাদুঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে এল, ঘুরে এসে শিশুপার্কের দিকে গেল কিছুদুর। তারপর দাঁড়িয়ে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে হেঁটেচলা লোকজন দেখল। তারপর একসময় হাল ছেড়ে বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করল বাংলামোটরের দিকে।

গোয়েন্দাগিরি করা খুব সহজ কাজ না, নিজেকে বুঝাতে শুরু করল সে। সরাসরি পথে নামার আগে অনেককিছু হিসেব করে নিতে হয়। যার ওপর নজর রাখা হবে তার

সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নিতে হয়। এজন্য গোয়েন্দা দপ্তরে বহু লোকজন রয়েছে। আরো বহু লোক খবর দিয়ে টাকা নেয়। আরো অনেক লোক খবর দেয় নিজের লাভ ছাড়াই, সমাজের ভাল করার জন্য। তার কিছুই নেই। সাহায্য করার মত একজনও নেই। সে একেবারে একা। এভাবে কোনকিছু না জেনে শুধু যায়গার কথা শুনে একজনকে খোঁজার চেষ্টা করা নিতান্তই হাস্যকর।

হাঁটতে হাঁটতে এসবই ভাবছিল অঞ্জন। ওর সামনে হেঁটে চলা লোকটাকে দেখে হঠাৎ করেই তাকে অনুসরন করতে ইচ্ছে হল ওর। আর কিছু যখন করার নেই তখন একে অনুসরন করে দেখা যাক। অন্তত সময় কাটানো যাবে। ব্যস্ত থাকা যাবে কিছু নিয়ে। একজন লোক হাঁটার সময় কি করে জানা যাবে।

প্রথমেই লোকটাকে দেখে তার সামাজিক অবস্থান অনুমান করার চেষ্টা করল সে। একবার মনে হল বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। আরেকবার মনে হল কিছু কমও হতে পারে। মাথার চুল কমে গেছে। খুব দামী না হলেও ভদ্র পোষাক। সাদা সার্ট, কালচে রঙের প্যান্ট। স্বাভাবিকের চেয়ে বরং মোটার দলেই ফেলা যায় একে। হাইটে তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক কম। হাতে কিছু নেই।

এ থেকে কি কিছু বোঝা যায়?

হয়ত মধ্যবিত্তের দলে ফেলা যায় একে। অফিস ছুটি হওয়ায় বাড়ি ফিরছে। হয়ত বাড়ি কাছেই, সেজন্য হেঁটে ফিরছে। অথবা কেউ তাকে হাঁটার পরামর্শ দিয়েছে। বলেছে হাঁটা স্বাসে'্যর জন্য ভাল। তাহলে শরীরের নিয়ন্ত্রন হারাবে না। মোটা হওয়ার দিকে যেমন ঝুঁকেছে সেটা থামানো যাবে। অথবা স্কুটার ভাড়া করার মত টাকা নেই পকেটে। কম টাকায় বাসেও যেতে চায় না। সেখানে ধাক্কাধাক্কি, পকেটমারের ভয়। এর বেশি মনে করতে পারল না অঞ্জন।

লোকটা হেঁটেই যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ডানে বামে তাকাচ্ছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কখনো দুহাত পকেটে রাখছে, কখনো একহাত রেখে আরেকহাত হাঁটার তালে ঝাঁকাচ্ছে, কখনও দুহাতই বাইরে রেখে ঝাঁকাচ্ছে। একবার রাস্তার পাশে একটা পত্রিকার দোকানের সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষন। মনেহয় দাঁড়িয়ে থেকে হেডলাইনগুলো দেখল, কি কি পত্রিকা আছে তার নাম দেখল। হাত বাড়াল না সামনে। আরেকবার দাঁড়িয়ে দেয়ালে লাগানো পোষ্টার পড়ল। কিসের যেন বিজ্ঞাপন। হলুদ রঙের কাগজে ছোট ছোট লেখা। একবার হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে নিজের জুতা দেখল। মাটিতে পা ঠোকা দেখে মনে হল হয়ত কোন সমস্যা সেখানে, কিংবা ব্যথা পাচ্ছে জুতায়। এরপর আবার হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে এক যায়গায় ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে কি হয়েছে বোঝার চেষ্টা করল। এছাড়া তার হাঁটায় কোন পরিবর্তন নেই। ধীরগতিতে একইভাবে হেঁটে যাচ্ছে। বাংলামোটরের মোড় ছাড়িয়ে, সোনারগার মোড় ছাড়িয়ে সামনের দিকে যেতে দেখে অঞ্জন ধারনা করল হয়ত বাড়ি কাছাকাছি কোথাও না, বোধহয় ফার্মগেট থেকে বাসে উঠবে। সে ফার্মগেটও ছাড়িয়ে মনিপুরিপাড়ার সামনে দিয়ে বিজয়সরনীতে পৌছাল একসময়। বামদিকে ঘুরে চন্দ্রিমা উদ্যানের মোড়ে এসে থামল। একযায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল লোকটা। যেন বেড়াতে এসেছে পার্কে।

একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল অঞ্জন। তার শরীর থেকে সেন্টের গন্ধ পাওয়া গেল এতটাই কাছে।

ততক্ষনে শুধু এই লোক সম্পর্কেই না, সাধারনভাবে অন্য লোকজনের হাঁটা সম্পর্কেও ধারনা করতে পেরেছে অঞ্জন। মানুষ এভাবেই হাঁটে। কোনদিকে শব্দ হলে, ভিড় দেখলে, ব্যতিক্রমি কিছু থাকলে তাকায়। ভালভাবে দেখেও না। আবার হাঁটতে থাকে। পেছনে তাকায় না একবারও। সে নিজেও তার পেছনে তাকায়নি একবারও।

কাউকে অনুসরন করা তাহলে খুব সহজ কাজ।

তাকে কেউ অনুসরন করছে নাতো? ভুলে গিয়েছিল সে, হঠাৎ করেই মোটা লোকটার কথা মনে হল। জুতার দোকানে ঢুকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল সে। সেই লোক, কিংবা সুলতান।

দাঁড়িয়ে ডানদিকে একবার নজর বুলাল সে। তার পেছনে কেউ হেঁটে এলে এদিকেই থাকার কথা। বেশ লোকজন ভীড় করেছে এখন। দল ধরে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন বসে রয়েছে এদিক ওদিক দল ধরে। কয়েকজন ফেরিঅলা জিনিষ ফেরি করছে। বাদাম, সিগারেট, ফ্লাস্কের চা এসব বিক্রি করছে। বেড়াতে আসা দলের লোকগুলিকে বাদ দিয়ে একা লোকগুলিকে লক্ষ্য করল সে। কেউ যদি তাকে অনুসরন করেই তাহলে সে একা থাকবে।

সুলতান কিংবা সেই লোক নেই।

লোকগুলিকে একনজর দেখে নিয়ে চেহারায় অন্যমনস্কভাব ফুঁটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা পার হল অঞ্জন। তার নিশ্চিত হওয়া দরকার আসলেই তাকে কেউ অনুসরন করছে কিনা। এখনো সে জানে না দ্বিতীয় লোকটার পরিচয়। সে সুলতানের মত তাকে রক্ষা করার জন্য তারসাথে ঘোরেনি। তাহলে অতটা দুরে থাকত না, কাছাকাছি থাকত। তার কোন বিপদ দেখলে রক্ষা করার মত শারীরিক সামর্থ্যও ওই লোকের নেই।

সে রাস্তা পার হয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানের পাশ দিয়ে হেঁটে মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ করেই থেমে ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। কেউ যদি তাকে অনুসরন করেই, সে এখন তার সামনে। হয় থামবে, উল্টোদিকে ঘুরবে, নাহয় সন্দেহ এড়াতে তাকে ছাড়িয়ে যাবে।

সরাসরি না তাকিয়েও অঞ্জন দেখতে পেল, একজন দাঁড়িয়েছে। আশেপাশের অন্যদের মত বেড়াতে বের হয়নি। নীল রঙের ওপর সাদা লতাপাতা আঁকা সার্ট গায়ে। একটু আগেই রাস্তার ওপারে দেখেছে সে এই লোককে।

বেশ মোটাসোটা লোক, আরেকজনের মতই, তবে এর স্বাস্থ্য ভাল। সেইসাথে লম্বা। মনেহয় ছয়ফুট ছাড়িয়ে যাবে, সেই অনুযায়ী প্রস'। এ যদি তাকে অনুসরন করেই থাকে তাহলে আরেকবার দেখলেই চেনা যাবে।

তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল অঞ্জন। লোকটা অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল সেখানেই। সোজা সামনের দিকে এসে মোড় পার হয়ে সংসদভবনের বিশ্বরোডের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বাদাম কিনল অঞ্জন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদাম খেতে লাগল।

ওই লোকটা এগিয়ে এসেছে এদিকেই। বেশ কিছুটা দুরে থেমেছে। ফুটপাতের ওপরই কৃষ্ণচুড়া গাছের নিচে একটা ফুলের দোকানের কাছে। ওখানে ছোট একটা চায়ের দোকান আছে। চা-সিগারেট-পান বিক্রি করে। মনে হয় চা দিতে বলল, অথবা পান। আগের লোকটা পান খেত। এ লোকটা অন্তত সিগারেট ধরায়নি এটা নিশ্চিত সে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না।

পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল অঞ্জন। এই লোক তার পেছনে লেগেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের লাভের জন্য মনে করারও কোন কারন নেই। এ অন্তত ছিনতাইয়ের সুযোগ খুঁজছে না। কেউ একজন একে লাগিয়েছে তার পিছনে। কে সে?

সুলতানকে লাগিয়েছিল এখলাস সাহেব। কেন? পরের দুজনকেও কি তিনিই লাগিয়েছেন? কতটা যুক্তিসঙ্গত সেটা?

সুলতানকে তার নিরাপত্তার জন্য লাগানো মেনে নেয়া যায়, এদুজনকে মেনে নেয়া যায় না। দুজনেই একাজের অনুপযোগী। আর যতটা দুরত্বে থেকে যে ভাবে চোখ রেখেছে তাতে সেটা সম্ভবও না। এরা শুধু চোখই রাখছে তার ওপর। দেখছে সে কোথায় যায়, কি করে, কারসাথে কথা বলে।

হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে হল অঞ্জনের। এরা সেই দলের। যাদের চারজনকে সে মেরেছে। সন্ত্রাসী বলে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সব যায়গায়।

তারহাতে এদের চারজন মারা গেছে। সেজন্যই পিছু নিয়েছে তার।

কি করতে চায় ওরা? প্রতিশোধ নিতে চায়?

যদি প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তাকে একটা গুলি করলেই চলত। অনেক আগেই সেটা করতে পারত এরা। সেটা একেবারেই সহজ কাজ। রাস্তায় গুলি করে হেঁটে গেলেও ধরা পরবে না। অস্ত্রহাতে লোককে কেউ বাধা দেয় না।

তারা সেটা করেনি। তারমানে বিষয়টা এতটা সরল না। আরো জটিল। এরা অন্যকিছু চায়।

এরা বোঝার চেষ্টা করছে তার পরিচয়। খোঁজখবর নিচ্ছে তার সম্পর্কে। চারজন টেনিংদেয়া লোককে গুলি করেছে সে। সেই জেরা করা পুলিশ বলেছে তাদের প্রত্যেকেরই শরীরে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ছিল। চারজনেরই মাথায় গুলি লেগেছে। সাধারন কেউ একাজ করতে পারে না। এখলাস সাহেব তার চিকিৎসা করিয়েছেন, ছাড়া পেয়ে সে তার অফিসে গেছে একথা নিশ্চয়ই ওরা জেনেছে। পুলিশ বিভাগে কোন রেকর্ড নেই এতথ্যও নিশ্চয়ই জেনেছে ওরা। এই বিষয়গুলোই হয়ত চিন্তায় ফেলেছে তাদের। দেখছে সে কোথায় যায়, কারসাথে যোগাযোগ করে, কার হয়ে কাজ করে।

নীলার বাবার কাছে কি তারই খোঁজ করছিল?

হঠাৎ করেই নিজেকে একজন কেউকেটা মনে হল অঞ্জনের। জেমস বন্ডের মত। চারজন সন্ত্রাসীকে সে গুলি করেছে এটাই সত্যি। রীতিমত বাহাদুরী করার মত কাজ।

কিন' আপাতত তার এই লোককে ছাড়ানো দরকার। আগের লোককে ছাড়িয়েছিল দুই দরজাঅলা দোকানে ঢুকে। একেও সেই চেষ্টা করবে নাকি?

বাদাম খেতে খেতে সংসদ ভবনের সামনে দিয়ে হেঁটে এসে আড়ং এর নিচতলায় ঢুকল অঞ্জন। এখানেও এভাবে ফাঁকি দেয়া সম্ভব। লোকটা যদি সামনের দিকে চোখ রাখে তাহলে সে ডানদিক দিয়ে বের হয়ে লালমাটিয়ার দিকে চলে যেতে পারবে।

ভেতরে কিছুক্ষন ঘোরাঘুরির পর সেখান থেকেই লোকটাকে খুঁজল সে। তাকে দেখা গেল রাস্তার ওপারে। সংসদভবনের দিকে রাস্তার ওপারে এমনভাবে বিল্ডিংএর কোনাকুনিভাবে দাঁড়িয়েছে যে দুদিকের রাস্তায়ই চোখ রাখতে পারবে। আগের লোকের কাছ থেকে শিখেছে নিশ্চিত।

একে অন্যভাবে খসাতে হবে। সাথে করে বাড়ি পর্যন- নেয়া যাবে না।

কিছু না কিনেই বাইরে বের হয়ে মোড় পার হয়ে আবার সংসদ ভবনের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করল অঞ্জন। হেঁটে গেল লোকটার পাশ দিয়েই। লোকটা স্বাস্থ্যবান হতে পারে, মারামারিতে পারবে না তার সাথে। যথেষ্ট ভারী শরীর। সেই ছিনতাইকারীকে ঘুসি মারার কথা মনে আছে ওর। এক ঘুসিতেই কাবু করে ফেলেছিল তাকে। তার হাত-পা ভালই চলে।

একে কাবু করতে হলে ফাঁকা যায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। খুব কঠিন হবে না সেটা।

হাঁটতে হাঁটতে আবার চন্দ্রিমা উদ্যানের মোড়ে এসে গেল অঞ্জন। রাস্তা পেরিয়ে পুরনো এয়ারপোর্টের দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে কিছু একটা করার সুযোগ পেল সে। লোকটা তার একটু পিছনে হেঁটে আসছে। কোন রাখঢাক নেই যেন। সে হঠাৎ করেই থামল এক যায়গায়। ঘুরল। সে থামতে লোকটাও থেমেছে। অঞ্জন সোজা এগিয়ে গেল তার কাছে।

'কি চাই?' সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল অঞ্জন।

হতভম্ভ লোকটা পকেটে হাত ঢুকাতে গেল। তাকে সে সুযোগ দিল না অঞ্জন। সজোরে লাথি মারল দুপায়ের মাঝখানে। উবু হয়ে বসে পরল লোকটা। থুতনির কাছে আরেকটা লাথি মেরে শুইয়ে দিল ওকে মাটিতে। রাস্তার লোকজন দেখতে পেয়েছে ঘটনা। কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে দেখার জন্য। ওদেরকে আসার সুযোগ দিল সে। লোকটা নড়াচড়া করছে না। বুঝেছে ওঠার চেষ্টা করলেই লাথি খেতে হবে।

এগিয়ে আসা লোকদেরকে দেখিয়ে ওর পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। ছোট পিস্তল।

'ছিনতাই-' পিস্তল দেখিয়ে বলল সে এগিয়ে আসা লোকগুলিকে।

মুহূর্তেই চাঞ্চল্য দেখা গেল লোকগুলির মধ্যে। নাগালের মধ্যে ছিনতাইকারী পেলে খুশীই হয় লোকজন। বেশ মনের ঝাল মেটানো যায়। দেখতে দেখতে রীতিমত ভীড় জমে গেল। লোকটাকে ঘিরে ধরল ওরা। লাথি, কিলচড় শুরু হয়ে গেল মুহূর্তে।

পিস্তলটা দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুড়ে ফেলে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন।

একদিনে অনেক ঘটনা, বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে একবার মনে করল অঞ্জন। কিন' তখনো আরো কিছু দেখা বাকি ছিল ওর। বাড়ির কাছাকাছি পৌছে থামতে হল তাকে।

'ভাইজান কি করেন?'

কেউ একজন প্রশ্ন করেছে তাকে। থেমে ঘুরে ভাল করে দেখল অঞ্জন। তিনজন। বয়স আঠার থেকে বাইশ হবে। এই বয়সে ছাত্র হওয়ার কথা। চেহারা-পোষাক বলে দিচ্ছে শুধু যে টাকাপয়সা আছে তাই না, ভদ্রঘরের। একবার মনে হল হয়ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খাতায় নামও আছে। এখন ইউনিভার্সিটির অভাব নেই, টাকা থাকলেই নাম লেখানো যায়। সেইসাথে অন্য সবকিছু ঠিক রাখা যায়।

'তুমি কি কর?' যে প্রশ্ন করেছে তাকেই জিজ্ঞেস করল সে।

থতমত খেল যেন ছেলেটা। সে এধরনের উত্তর আশা করেনি। সাধারনত সবাই আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলে।

আরেকজন এগিয়ে এল সামনে। রীতিমত ধমকে উঠল, 'কথার সোজা উত্তর দ্যান, নিলু কি হয়?'

তাকে নিয়ে আপত্তিটা কোথায় বুঝল অঞ্জন। হয়ত এদেরই কেউ টেলিফোনে আলাপ করেছে ফ্যাঁসফ্যেসে গলায়। দুজনের গলার স্বর সে শুনেছে, আরেকজন এখনও মুখ খোলেনি।

'তুই কে?' ধমকে উঠল অঞ্জন।

ওরা বোধহয় এতটা আশা করেনি। অঞ্জন দেখল বাকী দুজন কেটে পরার চেষ্টা করছে। নেহাত আত্মসন্মানের কারনে পারছে না। চারিদিকে লোকজন তাকিয়ে দেখছে। সামনেরজন বোধহয় বেশী পরিমানে ত্যাদোড়। লম্বা চুল, ভেজাভেজা। হাতে কালো কাপড়ের ব্যান্ড লাগানো। এটা কারো হাতে লাগানো থাকলে তাকে ভয় করে কথা বলা উচিত। বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা করল সে।

'এই মহল্লার পোলা।'

দুপা সামনে এসে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল অঞ্জন, 'মহল্লা পাহাড়া দিস? তোর বাপ কি পাহাড়া দেয়?'

'দ্যাহেন, মুখ সামলাইয়া কথা কন-'

আর কথা বাড়াল না অঞ্জন। বামহাতে ওর বুকের ওপর ঘুসি মারল। ঘুসি খেয়ে চিৎ হয়ে পরল ছেলেটা মাটিতে। বুক চেপে ধরেছে। কোনমতে উঠে বসল মাটিতে। অঞ্জন বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখল। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে, বোঝা যাচ্ছে সামনে আসবে না। পড়ে থাকা জন ওঠার চেষ্টা করছে। আর যা-ই করুন, এখন আর নতুন করে বীরত্ব দেখানোর চেষ্টা করবে না। এগিয়ে এসে কলার ধরে টেনে দাঁড় করাল ওকে।

'তোর বাপের নাম কি?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছে সে এখন। এক ঘুসির চোট এখনো ভোলেনি, তার ওপর বাড়ির খবর! এ-তো সহজ বান্দা মনে হচ্ছে না।

কলার ধরে ঝাঁকুনি দিল অঞ্জন, 'বল তোর বাপের নাম কি?'

এখনও মুখ খুলছে না সে। কলার ছেড়ে দিয়ে ঘাড়ের ওপর ধাক্কা দিল অঞ্জন, 'চল তোর বাপের কাছে যাই।'

ধাক্কা খয়ে দুপা সরে গেল সে। তারপরই টের পেল তার কলার ধরা নেই। ঘুরেই দৌড় দিল সামনের দিকে। মুহূর্তে একটা বাড়ির পাশ দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখল অঞ্জন, নিরাপদ দুরত্বে সরে গেছে। একপা দুপা করে সরছে। পা বাড়ালে এরাও দৌড় দেবে।

আশেপাশের লোকজন তাকিয়ে দেখছে। নিশ্চিতভাবেই এদের পছন্দ করে না এরা। নাজেহাল হতে দেখে খুশী হয়েছে। নিজেরা এদের কিছু বলে না কেন? অবাক হল অঞ্জন। চারিদিকে হাজার হাজার মানুষ এই উঠতি মাস্তানদের দেখে চুপ করে থাকে। দিনে দিনে আরো বড় মাস্তান হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কেউ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে না। আশা করে পুলিশ কিংবা অন্য কেউ তাদের রক্ষা করবে। সেটা কিভাবে সম্ভব?

ঘুরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সে।

পরদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসাদগেট থেকে বাসে উঠল অঞ্জন। শাহবাগ মোড়ে এসে নামল বাস থেকে। ওর মন বলছে এই যায়গাটা ওর জন্য খুব গুরুত্বপুর্ন। এই যায়গায় কিছু একটা ঘটবে। অথবা ঘটেছে ওর জীবনে। যার কথা মনে করতে পারছে না সে। এখানেই সে খুঁজে পাবে নিজের পরিচয়।

বিনা কারনেই হেঁটে বেড়াল সে রাস্তা ধরে। একবার হেঁটে ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত গেল। মনে করার চেষ্টা করল ভেতরের পরিবেশ। অন্তত এখানে পড়াশোনা করেনি সে। করলে দুচারটা বিল্ডিং চিনত। ভেতরের যায়গা চিনত। মনে হচ্ছে কখনো ভেতরে ঢোকেনি সে।

ঘুরে আবার ফিরে এল সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের পাশ দিয়ে। মোড়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে রমনা উদ্যানের দিকে হাঁটতে লাগল। তখন সে লক্ষ্য করল লোকটাকে। আগের ফলো করা লোক। পরেরজন ব্যর্থ হওয়ায় আবার আগেরজনকে লাগিয়েছে তার পিছনে। এই লোকের কাজ সম্ভবত দুরত্ব রেখে চলা। সে কোথায় যায়, কি করে দেখা। এ লোকটা সে বিষয়ে বেশ সতর্ক। একেবারেই কাছে আসে না। সে কারনেই একবার খুব সহজে তাকে খসাতে পেরেছিল অঞ্জন।

এভাবে তাকে অনুসরন করার কারন কোন হিসেবে ফেলতে পারছে না অঞ্জন। নিশ্চয়ই তার বাড়ি চিনেছে। বাড়ির ওপর চোখ রেখেছে। সে যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছে

তখন থেকেই পিছু নিয়েছে। নাহলে সে এখানে আসবে একথা জানতে পেত না কোনভাবেই। সে নিজেও জানত না এখানে আসবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় পার্কে ঢুকে গেল অঞ্জন। একযায়গায় কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ভীড়ের মাঝখানে মাটিতে বসে গান করছে একজন। লালনের গান। গায়ককে দেখে মনে হল অন্ধ। হাতে দোতারা। লোকজন কিছু পয়সা দিয়েছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তার সামনে মাটিতে। লোকটার গান ভাল লেগে গেল অঞ্জনের। সুরেলা গলা, 'পাড়ে লয়ে যাও আমায়।' স্পষ্ট উচ্চারন। নিজের আবেগ ফুটিয়ে তুলেছে সুর দিয়ে। মনোযোগ দিয়ে গান শুনতে লাগল সে।

হঠাৎই সে পিছনে একজনকে অনুভব করল।

কেউ খোঁচা মেরেছে তার পকেটে। পকেটমার এটা করে তার জানা। খোঁচা মেরে দেখার চেষ্টা করে পকেটের মালিক কতটুকু শতর্ক, একইসাথে সেখানে কি আছে সেটাও বোঝার চেষ্টা করে। সুবিধে না হলে হাত বাড়ায় না।

অপেক্ষা করে থাকল সে। এত সহজে হাল ছাড়বে না পেছনের জন। সে টের পেয়েছে সেটা বুঝতে দেয়নি একেবারেই। বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না। একটুপরই আবার পকেটের ওপর চাপ অনুভব করল সে। চাপ কমার সাথেসাথে তার পকেটের জিনিষ উধাও হয়ে যাবে। হাত বাড়িয়ে একজনের কব্জি চেপে ধরল সে। কব্জির মালিক টান দেবার চেষ্টা করল, অঞ্জন ছাড়ল না। হাতটা চিকন। বোঝা যায় বেশী জোর নেই হাতে। তারচেয়েও বড় কথা, এভাবে টানাটানি করলে পাবলিকের চোখে পরবে। হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না তখন।

ওরদিকে না তাকিয়েই আস্তে আস্তে ভীড় থেকে বের হল অঞ্জন। কব্জি ধরে হাতের মালিককে বাইরে এনে ফেলল। এগিয়ে গেল একপাশে। একটু দুরে ফাঁকা যায়গায় একটা গাছের সামনে এসে মুখোমুখি করল ওকে। রোগাপাতলা একজন লোক। বয়স আন্দাজ করা কঠিন, ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। গাল ভাঙা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। একেবারেই গোবেচারা চেহারা।

'কি হয়েছে?' সহজভাবেই জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

লোকটা তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষন। অঞ্জনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। অবাক হয়েছে সেও অঞ্জনের আচরনে। তারপরই হেঁসে ফেলল।

'মিসটেক হইছে বস, ভুল যায়গায় হাত পরছে।'

অবাক হয়ে ওর হাসিহাসি মুখের দিকে চেয়ে থাকল অঞ্জন। পকেট মারতে গিয়ে ধরা পরেছে অথচ এতটুকু সংকোচ নেই। যেন কিছুই হয়নি। নিশ্চয়ই খুব ভাল করে জানে ওর কি অবস্থা হতে পারে এখন। একবার পকেটমার বলে ডাক দিলে হয়ত মারাই যাবে। আশেপাশে কয়েক ডজন মানুষ ভীড় করে আছে।

নাকি সবকিছুতেই অভ্যস' হয়ে গেছে? অঞ্জনের একবার মনে হল বোধহয় তারই ভুল, এ লোক পকেট মারতে যাচ্ছিল না।

‘পকেটে হাত ঢুকাচ্ছিলে কেন?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘ধান্দাপানি করতাছিলাম বস।’ অকপট উত্তর দিল লোকটা।

বিরক্ত হল অঞ্জন। কেউ অন্যায় করে ধরা পরলে তার সংকোচ করা উচিত। ভয় পাওয়া উচিত। এলোক সে পথে যাচ্ছে না। এই লোকের মুখে হাঁসি যেন ক্রমেই বাড়ছে।

‘হাঁসি থামাও।’ ধমক দিল সে।

হাঁসি থামল না, আরো বাড়ল। খিক খিক করে হাঁসতে শুরু করল লোকটা। নিজেই অপ্রস'ত হয়ে গেল অঞ্জন।

‘এ্যাই-’

ধমক খেয়ে হাঁসি থামল লোকটার। তারপরই আবার শুরু হল। অঞ্জনের মনে হল লোকটা পাগল। না হলে এই অবস্থায় এভাবে হাঁসতে পারে না কেউ।

‘একটা ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দেব।’

লোকটা থামল একটু। অঞ্জনকে দেখল আবারো ভাল করে। তারপর তাকে হতভম্ভ করে দিল একেবারে।

‘আবার লাগায়া লমু-’

আবার খিকখিক হাঁসি। থ হয়ে গেল অঞ্জন। কোন কথা বের হল না তার মুখ দিয়ে। লোকটা হেঁসেই যাচ্ছে। যেন অঞ্জনই মজার কিছু করেছে। একসময় থামল সে।

‘দ্যাখবেন বস ক্যামনে দাঁত লাগায়? এই যে এ্যামনে-’

মুখে হাত ঢুকিয়ে একটা টান দিয়ে দাঁতের পাটি খুলে ফেলল সে, তারপরই আবার লাগাল। পুরো দাঁতের পাটি ফলস।

না হেঁসে পারল না অঞ্জন। এই লোকটা তার পরিস্থিতি মেনে নিয়েছে। তার যা-ই হোক, যে যা-ই করুক তার কিছু যায় আসে না। একে পুলিশের হাতে দিলে হাঁসতে হাঁসতে থানায় যাবে, হাজতে বসেও হাসবে। সে অভিজ্ঞতাও বোধহয় ভালমতই আছে।

অন্যপথে যাওয়ার চেষ্টা করল অঞ্জন। এর ওপর রাগ করে কোন ফায়দা হবে না। গলার স্বর নরম করে জিজ্ঞেস করল সে, ‘কত ধান্দাপানি হয়, দিনে?’

‘তার কি ঠিক আছে বস, সবই ভাগ্য। কোনদিন ছক্কা কোনদিন ফক্কা।’

‘কত হলে চলে?’

‘চালাইলে তো বস, না খাইলেও চলে-’

‘হুঁ, কে আছে বাড়িতে?’

‘কেউ না। যেইহানে রাইত সেইহানে কাইত।’

‘গতরাতে ছিলে কোথায়?’

হাত তুলে একটা দিক দেখাল লোকটা। মনে হল হাইকোর্টের দিক। অঞ্জনের মনে হল খিদে পেলে খেতে হয়, রাতে ঘুম পেলে কোথাও ঘুমাতে হয় এটাই এর জীবনের একমাত্র বাস্তবতা।

অন্যকিছু ভাবছে অঞ্জন। লোকটা অভিজ্ঞ এতে কোন সন্দেহ নেই। পথেঘাটে থাকে মানে মানুষ চেনে। বুঝে গেছে অঞ্জন একে মারবে না।

একে কাজে লাগানো যায় কি? ঝুঁকি নিয়ে যখন পকেট মারতে যায় তখন সুযোগ পেলে অন্য কাজও করবে। ভয় একটাই, টাকা নিয়ে কেটে পরা।

অঞ্জন বলল, 'আচ্ছা, আমি কিছু টাকা দেব, একটা কাজ করে দিতে হবে। পারবে না?'

অঞ্জন দেখল লোকটার মুখ থেকে হাসিভাব চলে গেছে এখন পুরোপুরি। পকেট মারতে গিয়ে ধরা পরলে তারসাথে কেউ এভাবে আলাপ করে না। অঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কি কাজ দিতে পারে সে। খুব পরিশ্রমের কাজ? অবৈধ কোন কাজ? এধরনের কাজেই সাধারনত রাস্তার কাউকে ডাকে বড়লোকেরা।

তাকে বেশি চিন্তা করতে দিল না অঞ্জন। বলল, 'একজন লোকের পিছনে পিছনে ঘুরবে। সে কোথায় যায়, কার সাথে কথা বলে, কি আলাপ করে এসব জানবে, তারপর আমাকে জানাবে। পারবে না?'

'মাইয়া লোক না পুরুষ মানুষ?

'পুরুষ মানুষ। পারবে না?'

'চেষ্টা করুম।'

'তাহলে সাবধানে ডানদিকে তাকাও। দেখ খয়েরি-কালো চেক সার্ট গায়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, কালো প্যান্ট। মোটামত। ওই লোক। আমি ওই চায়ের দোকানে যাচ্ছি। একটুপর ওখানে ঢুকবে, হাতখরচ যা লাগে তার টাকা নিয়ে আসবে।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন। না তাকিয়েও বুঝতে পারল লোকটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। তারদিকে তাকাচ্ছে না, লোকটার দিকেও না। সেই লোকটাও সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে একই যায়গায়। গেটের বাইরে। অপেক্ষা করছে তার বাইরে যাওয়ার।

চা খেয়ে কুদ্দুসকে দুশোটাকা দিয়ে সন্ধ্যা ছ'টায় পার্কের গেটে দেখা করার কথা জানিয়ে বাইরে বের হল অঞ্জন। এখন বেশ ভাল লাগছে তার। সেও কিছু একটা করছে। এখন প্রয়োজন লোকটাকে তার পিছন থেকে খসিয়ে কুদ্দুসকে সুযোগ করে দেয়া।

হাঁটতে হাঁটতে আবার শাহবাগ মোড়ে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। বাসষ্ট্যান্ডে দাঁড়াল কিছুক্ষন। একটা মিনিবাস যখন ছেড়ে দেবে ঠিক সেইমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাতে। শেরাটনের মোড়ে গতি কমাতেই লাফ দিয়ে নেমে গলিতে ঢুকল। একটা আড়াল নিয়ে দাঁড়াল। লোকটা অন্য বাসে উঠে গেলেও দেখতে পাবে না তাকে।

সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল অঞ্জন। বাড়ির দিকে গেল না। লোকটা তাকে হারিয়ে আর কোথাও না পেলে বাড়ির আশেপাশে অপেক্ষা করবে। তাকে দেখলেই আবার পিছনে লাগবে। যেখানেই যাক, কুদ্দুস তাকে দেখবে।

বেড়াতে ভাল লাগছে অঞ্জনের। আগে কখনো রাস্তার মানুষের দিকে এভাবে লক্ষ্য করেনি সে। এখন সে দেখতে পেল কত বিচিত্র ধরনের মানুষ রাস্তায় চলে বেড়াচ্ছে। বিচিত্র পেশা, বিচিত্র আচরন, বিচিত্র পোষাক, বিচিত্র আকার। সে মানুষ দেখতে লাগল। তার মনে হল মানুষ দেখার জন্য দোকান সবচেয়ে ভাল যায়গা। বিভিন্ন ধরনের ক্রেতা, বিভিন্ন ধরনের বিক্রেতা। একজনই একসময় ক্রেতা আরেকসময় বিক্রেতা। দেখতে দেখতে বিভিন্ন দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে থাকল সে। দুপুর গড়িয়ে গেলেও তার খেতে ইচ্ছে হল না। নতুন নতুন মার্কেট হয়েছে অনেক। অকারনেই বিভিন্ন মার্কেটের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল সে।

হাঁটতে হাঁটতেই দেখল শাড়ী পড়ে একটা মেয়ে আসছে সামনের দিকে থেকে। ভালকরে না তাকিয়েই অঞ্জনের মনেহল ছোট মেয়ে শখ করে শাড়ী পড়েছে। শাড়ি সামলাতে উচু করে করে পা ফেলে সাবধানে হাঁটছে। ছোট মেয়ে শাড়ি পড়লে তাকে পুতুল মনে হয়। একেও মনেহল হেঁটে যাওয়া পুতুল। উচু স্যান্ডেল পায়ে দিয়েছে। খটখট শব্দ করে হাঁটছে। ওর পাশ কাটিয়ে গেল। না দেখেও অঞ্জনের মনে হল ওকে পাশ কাটিয়ে যেন থামল। কয়েকপা গিয়ে সেও থেমে ঘুরে তাকাল মেয়েটার দিকে।

রেবেকা।

অবাক চোখে চেয়ে আছে অঞ্জনের দিকে। দ্রুত এগিয়ে গেল অঞ্জন।

‘কেমন আছেন?’

‘ভাল। না দেখেই চলে যাচ্ছিলেন।’ রীতিমত অবাক হওয়া চোখে তাকিয়ে আছে রেবেকা।

‘চিনতে পারিনি। শাড়িতে আপনাকে একেবারে ছোট দেখাচ্ছে।’

আসলেই শাড়ি পরে আরো ছোট মনে হচ্ছে রেবেকাকে। লাল-হলুদ মেশানো রঙ। তার ওপর বিশাল বিশাল সাদা চেক। চুল ফাঁপানো। হাতে মাঝারি সাইজের একটা চামড়ার ব্যাগ। দেখে মনে হচ্ছে নতুন। এখনো দাম লেখা ষ্টিকার লাগানো। সুন্দর নক্সাকাটা। বলার মত আরকিছু না পেয়ে সেদিকে নজর দিল অঞ্জন, ‘খুব সুন্দর ব্যাগটা। এখন কিনলেন?’

‘হ্যাঁ। ছোটবোনকে পাঠাব। দেখুনতো ঠকাল নাকি। চারশ টাকা নিল।’ ব্যাগটা উচু করে ধরল রেবেকা।

অঞ্জন বলল, ‘আমি ব্যাগের দাম জানি না। সুন্দর লাগছে দেখতে।’

রেবেকা হাঁসছে উত্তর শুনে। বলল, ‘আচ্ছা তাতেই হবে। যাচ্ছেন কোথায়?’

‘কোথাও না। আমার যাওয়ার যায়গা নেই।’

‘মনে করতে পারেননি এখনো?’

‘না।’

হঠাৎ করেই হাঁসি থেমে গেল রেবেকার। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। অঞ্জন দেখল রাস্তার কয়েকজন তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। এখানে মানুষের কৌতুহল খুব বেশী। কোন মেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারো সাথে কথা বলছে দেখলে তো কথাই নেই। ভীড় করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে থাকে।

তাকে অনুসরন করা লোকটাকে এখনো একবারও দেখেনি সে। হয় সত্যিসত্যিই তাকে হারিয়ে ফেলেছে, নয়ত আরো সাবধান হয়েছে। আরও সাবধানে আড়ালে কোথাও দাঁড়িয়েছে।

অঞ্জন বলল, 'চলুন কোথাও বসি। চাইনিজে বসবেন?'

রেবেকা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'না। ওরা অনেকগুলো করে টাকা নেয়।'

অঞ্জন হেঁসে ফেলল, 'আজ আপনি আমার গেষ্ট। চলুন কিছু খেতে হবে। দুপুরে খাওয়া হয়নি।'

বলেই হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন। কথা না বাড়িয়ে সঙ্গি হল রেবেকা।

'না খেয়ে পথেপথে ঘুরছেন?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ। ঘুরলে কিছু দেখে যদি মনে পরে।'

'ওষুধ খাচ্ছেন ঠিকমত?'

'না। আমি ওষুধের নাম ভুলে গেছি।'

'বলেননি কেন?' হঠাৎ করেই দাঁড়িয়ে গেল রেবেকা। থেমে বিরক্তি দেখাল, 'ও, ব্যথা নেই দেখে ভেবেছেন সব ঠিক হয়ে গেছে? একবার এসে ডাক্তার দেখিয়ে যাবেন।'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটু পরই হাত তুলে একটা রেষ্টুরেন্ট দেখাল রেবেকা। বলল, 'ওই রেষ্টুরেন্টটায় যাব। বেশ নিরিবিলি। আপনি এখানে একটু দাঁড়ান।'

অঞ্জনকে ওখানেই রেখে হেঁটে রাস্তার পাশে দোকানের দিকে গেল রেবেকা। অঞ্জন দেখল ও ঢুকল একটা ওষুধের দোকানে। বেশ বড় ওষুধের দোকান। তাকে অনুসরন করা লোকটাকে আবারও দেখার চেষ্টা করল অঞ্জন। ওর মন বলছে রেবেকার সাথে তাকে দেখে ফেলা ঠিক হবে না। এখনও দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। মনেহয় সত্যিসত্যিই হারিয়ে ফেলেছে তাকে।

দোকানদারের কাছে ওষুধ নিয়ে হাতের ব্যাগটায় রেখে ফিরল রেবেকা।

'চলুন।'

রেষ্টুরেন্ট নিচতলা-দোতলা মিলিয়ে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। রাস্তার দিকে কাঁচের জানালার কাছে টেবিল নিয়ে বসল।

'কি খাবেন? আমি শুধু চা খাব।' বসেই জানিয়ে দিল রেবেকা।

'আপনাকে খেতে হবে। নাহলে আমিও শুধু চা খাব।'

'বেশ, কি খাবেন?' হার মানল রেবেকা।

অঞ্জন চারিদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কি খাওয়া যেতে পাবে। ওদের পাশের টেবিলে মোটামত এক লোক কাবাব দিয়ে রুটি খাচ্ছে। ঢোকার সময় অনেকগুলো আস্ত মুরগির রোস্ট ঝুলে থাকতে দেখেছে। মনে হচ্ছে এগুলোই এখানকার মুল খাবার।

'কাবাব আর রুটি।'

কাবাব আর রুটি দিতে বলে অপেক্ষা করল ওরা। টেবিলে সালাদের প্লেট রেখে গেল একজন। ঠান্ডা পানির বোতল আর গ্লাশ দিয়ে গেল। রেবেকা হাতের ব্যাগটা রাখল টেবিলে। অঞ্জনের পিছনদিকে বসা লোককে লক্ষ্য করছে সে। তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে।

'লোকটাকে দেখেছেন?' একসময় বলল সে।

অঞ্জন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল। তার পাশের দিকে কোনাকুনি টেবিলে কাবাব-রুটি খাওয়া লোক। আরো খাবার এনে দিয়েছে বেয়ারা। প্লেটে উচু করে রাখা খাবার। খাওয়া ছাড়া অন্য কোনদিকে যেন মনোযোগ নেই লোকটার। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। সে ধরতে পারল না কি দেখাচ্ছে রেবেকা।

রেবেকা বলল, 'এইসময় পেট ভরে হোটেলে খাচ্ছে। নিশ্চয়ই বাড়িতে কোন সমস্যা আছে।'

অবাক হল অঞ্জন। ও ছেলেমানুষী করছে না মমত্ব দেখাচ্ছে লোকটার জন্য ধরতে পারল না। কপালের ওপর থেকে চুল টেনে সরাল রেবেকা। অঞ্জন লক্ষ্য করল রেবেকার কানে দুল। টকটকে লাল রঙের ছোট্ট পাথর কানের সাথে লাগানো। আলো পড়ে ঝিকমিক করছে।

'বাড়িতে সমস্যা থাকবে কেন? হয়ত দুপুরে খাওয়ার সময় পায়নি।' বিষয়টি হাল্কাভাবে দেখার চেষ্টা করল অঞ্জন।

'আমি অন্যদিনও দেখেছি। ওই টেবিলেই বসে সবসময়।' রেবেকা জানাল।

আরেকবার লোকটার দিকে তাকাল অঞ্জন। লোকটা এমনভাবে খাচ্ছে যেন খাবার ছাড়া পৃথিবীতে আরকিছু নেই। এবার সে লক্ষ্য করল লোকটা অতিরিক্ত মোটা। চলাফেরা করতে কষ্ট হয় এতটাই মোটা। মনেহয় বাড়িতে খেয়ে মন ভরে না। ডায়াবেটিস থাকলে নাকি প্রচুর খিদে পায় অথচ খেতে দেয় না। তেমন কিছু হবে হয়ত। রেবেকার দিকে ফিরল সে। লোকটার যত খুশী খাক, কাউকে বিরক্ত তো করছে না।

রেবেকা এদিকে এত দৃষ্টি দিচ্ছে কেন? একবার মনে হল তার। হয়ত নার্স হিসেবে মনে করছে লোকটা এভাবে নিজের বিপদ ডেকে আনছে আরো। রেবেকা নিজে মনেহয় আশেপাশেই থাকে। সেজন্যই এই হোটেল চেনে। লোকটাকে দেখেছে এখানে।

'আপনার হোষ্টেল কি কাছেই?'

'হ্যাঁ।'

'হেঁটে যাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ।'

'বের হয়ে অন্য কোথাও যাবেন?'

'না।'

‘তাহলে এখান থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনাকে এগিয়ে দেব। আপনার আপত্তি নেই তো?’

সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ল রেবেকা।

ওদের খাবার দিয়ে গেছে। খেতে শুরু করল অঞ্জন। খিদে পেয়েছে তার। রেবেকা সাবধানে রুটির একটা কোনা ছিঁড়ে মুখে দিল।

‘আপনার বোন কিসে পড়ে?’ বলার আর কিছু না পেয়ে প্রশ্ন করল অঞ্জন।

‘গতকাল ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট দিয়েছে। খুব ভাল করেছে। ওকে মেডিকেলে ভর্তি করাব।’

থার্ড ইয়ার পর্যন্ত মেডিকেলে পড়েছে, মনে পরল অঞ্জনের। একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে কোর্স শেষ করল না কেন। সাথেসাথেই ইচ্ছে ত্যাগ করল সে। উত্তর দেবে না, নিশ্চিতভাবেই কথা বন্ধ করে দেবে। নিশ্চয়ই কোন কারনে বাধ্য হয়েছে। ছোটবোনকে দিয়ে শখ মেটাতে চাইছে।

‘আপনার দিন কেমন কাটছে?’ জানতে চাইল রেবেকা।

অঞ্জন বলল, ‘ভাল। ইচ্ছেমত ঘুমাই, খাই-দাই, ঘুরে বেড়াই। কোন বাধা নেই। মনে হয় সারাজীবন এমন হলে মন্দ হত না। এমনি করে যায় যদি দিন যাক না।’

শুনে বিরক্ত হল রেবেকা, ‘কবিত্ব করতে হবে না। সারাজীবন পরের ঘাড়ে থাকতে পারবেন?’

অঞ্জন সায় দিল তার কথায়। বলল, ‘না বোধহয়। আর কদিন দেখব।’

‘তারপর কি করবেন?’

অঞ্জন ভাবল একটু। তারপর বলল, ‘বুঝতে পারছি না। আর কিছু না হলেও অন্তত আয়ের চিন্তা করতে হবে। অনেক দেনা হয়ে গেছে।’

একটু ইতস্তত করল রেবেকা। তারপর বলল, ‘পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলে হত না। আপনার পরিচিত কেউ যোগাযোগ করত-’

শুনে ভাবতে লাগল অঞ্জন। একথা একবারও মনে হয়নি তার। তার পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন তার খোঁজ করছে না কেন? নাকি করছে? সবযায়গায় খুঁজে মরছে। কেউ কেউ হয়ত চিন্তায় খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

‘আপনার কিছুই মনে পরছে না?’ ওর চিন্তা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রেবেকা।

অঞ্জন বলল, ‘কেমন যেন আবছাভাবে একটা বাড়ির কথা মনে হয়। দেয়াল ঘেরা দোতলা বাড়ি। উঠানের কাছে বড় একটা গাছ। তারপরই হারিয়ে যায়। মাথায় যন্ত্রনা শুরু হয়।’

রেবেকা বলল, ‘বাইরে বাইরে ঘুরবেন না। মাথাটাকে বিশ্রাম দিন কিছুদিন। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলে দুর্ঘটনার আগের সব মনে পরবে।’

অঞ্জন বলল, ‘আচ্ছা এমন কি হয় কখনো? কিছু মনে থাকবে কিছু মনে থাকবে না এমন? আমি জেসমিনের কথা মনে করতে পারি। ওকে দেখেছি একসিডেন্টের আগে। অথচ আমি

নিজে কোথায় ছিলাম কি করতাম মনে করতে পারছি না। খুব অস্বাভাবিক লাগছে আমার কাছে। মাঝেমাঝে মনে হয় মাথায় আরেকটা ঘা মারি, যদি মনে পরে-'

'ওটা সিনেমা নাটকে হয়।' চাপাস্বরে বলল রেবেকা।

বোঝা যাচ্ছে রেগে গেছে রেবেকা। রাগ চেপে রাখতে পারে না মেয়েটা। হাসপাতালে পুলিশ অফিসারকে ধমক দিয়েছিল মনে আছে অঞ্জনের।

নিজেকে সামলে নিয়ে রেবেকা বলল, 'কাল বিকেলে হাসপাতালে আসবেন স্যারের কাছে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।' সায় দিল অঞ্জন, 'টাকা আনতে হবে?'

'না টাকা লাগবে না।'

'ভালই।' হেঁসে ফেলল অঞ্জন, 'এজন্যই মনেহয় তাড়াতাড়ি সারা দরকার নেই। সবাই কত যত্ন নিচ্ছে।'

'পারলে থাকুন সারাজীবন। '

আবার রেগে যাচ্ছে রেবেকা। আরো রাগাতে ইচ্ছে হল অঞ্জনের।

'ভালই তো লাগছে। আমি সেরে উঠলেই আপনি আমাকে ভুলে যাবেন।'

উত্তর দিল না রেবেকা। মাথানিচু করে বসে থাকল। কোন প্রসংগ এড়িয়ে যাওয়ার সবচেয়ে সহজ পন'্া মনেহয় চুপ করে থাকা। তবে এবারে চুপ করে না থেকে প্রসংগ পাল্টাল।

জিজ্ঞেস করল, 'দিন কাটাচ্ছেন কি করে?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে।'

লোকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল অঞ্জন। রাস্তায় ঘোরার কথা বলতেই তাকে অনুসরন করা লোকের কথা মনে পড়ল তার। বলল, 'নতুন একটা কাজ জুটেছে। রাস্তায় বের হলেই কেউ একজন পিছু নেয়। তারসাথে লুকোচুরি খেলি।'

হাঁসতে হাঁসতেই বলল অঞ্জন। চোখ বড়বড় হল রেবেকার।

'ক্যামন লোক?'

'প্রথমে ছিল পিস্তলঅলা একজন। তারপর মোটাসোটা নাদুসনুদুস গড়নের একজন, তারপর রেসলারের মত স্বাস্থ্যঅলা একজন। তারকাছেও পিস্তল ছিল। পিস্তল বের করতে চেষ্টা করেছিল।'

স্বাভাবিকভাবেই বলার চেষ্টা করল অঞ্জন। সোজা না তাকিয়েও বুঝল, অপলক চেয়ে আছে রেবেকা।

সে আস্বত্ব করল তাকে, 'ভয়ের কিছু নেই। এখন পর্যন্ত কেউ ক্ষতি করেনি। আমি যেখানে যাই সেখানে যায়, তারপর সুযোগমত আমি কেটে পরি।'

রেবেকা বলল, 'এখলাস সাহেবকে জানান। উনি আপনার কথা শুনবেন।'

একটু সময় নিল অঞ্জন উত্তর দিতে। বলল, 'অন্তত প্রথমজন এখলাস সাহেবের লাগানো লোক।'

কি যেন ভাবছে রেবেকা। কোন কথা না বলে মুখ নিচু করে রেখেছে। তার সামনে বসা এই যুবককে চেনে না সে। সে নিজেও জানে না কি কারনে, তার ক্ষতি হোক এটা সে চায় না। এর চেহারা দেখে, কথাবার্তা শুনে মনে হয় এ কোন খারাপ কাজের সাথে থাকতে পারে না। অত্যন্ত মার্জিত, ভদ্র আচরন। নিজের পরিচয় মনে করতে পারছে না। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছে। এখন সে নিজেই আরো বড় বিপদে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে, হাঁসছে, তবু বোঝা যায় মনের মধ্যে ঝড় লুকিয়ে রেখেছে। প্রানপন চেষ্টা করছে নিজের পরিচয় জানতে।

রেবেকা থেমে থেমে আস্তে আস্তে বলল,'বাড়ি থেকে বেশি বের হবেন না। এ অবস্থা বেশীদিন থাকে না। দুচারদিন গেলে সব মনে পরবে, তখন আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাবেন।'

ব্যাগ থেকে ট্যাবলেটের ছোট একটা প্যাকেট বের করল, 'এগুলো রাখুন। আটঘন্টা পরপর একটা করে খাবেন। দিনে তিনটা।'

রেবেকার চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করল অঞ্জন। চোখ নামিয়ে রেখেছে। টেবিল থেকে ট্যাবলেটগুলো নিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢুকাল সে। মনে হচ্ছে বিদেশি ওষুধ। নিশ্চয়ই অনেক দাম।

'আমাকে হাসপাতালে এনেছিল কে বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

অবাক হল রেবেকা প্রশ্ন শুনে। বলল, 'আমি ছিলাম না সেসময়। শুনেছি যেখানে একসিডেন্টটা হয় ওদের লোক ছিল। প্রথমে এম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে, তারপর ওদের নিজেদের গাড়ি এসে দিয়ে গেছে। কেন?'

অঞ্জন বলল, 'আমার পকেট থেকে সবকিছু কেউ বের করে নিয়েছে। নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল যা থেকে আমার পরিচয় জানা যাবে। খোঁজ করে দেখা দরকার তেমন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছেন। আজই একবার খোঁজ নিন। ওই লোকজনের চোখ এড়িয়ে যাবেন।'

কোনকিছু না ভেবেই বলেছে, অনুমান করল অঞ্জন।

খাওয়া শেষ হয়েছে। সে বের হওয়ার প্রস'তি নিল। ঠিক করে ফেলল রেবেকার সাথে সে যাবে না। ওই লোক তার পিছনে আসলেই আছে কিনা নিশ্চিত না সে। ওই লোককে রেবেকার ঠিকানা জানানোর কোন ইচ্ছে নেই তার।

'আমি আপনার আগে বের হব।' জানাল অঞ্জন, 'বাইরে লোকটা থাকতে পারে। তাহলে বের হলেই আবার পিছু নেবে। বলে দিলে আপনার ঠিকানা বের করতে পারব না, পরে?'

'হ্যাঁ, এদিক দিয়ে সোজা মিনিট পাঁচেক হাঁটলে কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল লেখা সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। হাতের ডানদিকে।'

'আমি বের হওয়ার পাঁচ মিনিট পর বের হবেন।'

বলে উঠে দাঁড়াল অঞ্জন। তারপরই মনে হল এটা ভাল দেখাচ্ছে না। আশেপাশের লোকজন তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। একসাথেই বের হল দুজন। বের হয়ে রেবেকাকে যেতে বলে হোস্টেলের বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল। হেঁটে এদিকের মোড়ে এসে থামল অঞ্জন। লোকটাকে এখনো একবারও দেখেনি সে। আসলেই হয়ত খুঁজে পায়নি তাকে। কুদ্দুস লেগে আছে পেছনে, ছটায় তারসাথে দেখা করলে জানা যাবে কি ঘটেছে। আরো ঘন্টাদুয়েক সময় কাটাতে হবে তাকে।

মোড়ে দাঁড়িয়ে কোনদিকে যাবে ভাবছিল অঞ্জন। সে লক্ষ্য করেনি একজন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে।

'স্লামালেকুম স্যার।'

ঘুরে তারদিকে ভাল করে তাকাল অঞ্জন। চিনতে পারল না। সাধারন পোষাক। রোগা পাতলা গড়ন।

সেলিমের মত কেউ? তাকে চেনে অথচ সে চেনে না? বেশী ভাবতে হল না, সে নিজেই পরিচয় দিল।

'চিনতে পারেন নাই স্যার? সেদিন যে ঘুষাডা দিলেন।'

সাথে সাথে চিনল অঞ্জন। রাস্তায় ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে এসেছিল। তখন অন্ধকারে মুখটা ভালভাবে দেখা যায়নি। এখন দেখে নিতান্ত গোবেচারা মনে হচ্ছে। বয়স বড়জোর কুড়ি ছাড়িয়েছে।

'কি করছ এখন? আগের ব্যবসা?' জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

'না স্যার, ওই কামে আর নাই।'

'কেন? এক ঘুসিতেই ছেড়ে দিলে?'

মাথা নিচু করে বোকার মত হাঁসল যুবক, 'এক ঘুসাতেই কি ছাড়া যায় স্যার। ঘুসা তো জীবনে কতই খাইছি। লেখাজোখা নাই। সেদিন বাড়িত গিয়া বউরে আপনের কতা কইছি। বউ কসম করাইছে। খারাপ কাম করতে মানা করছে। কইছে কবে পাবলিকের হাতে ধরা খাইয়া মরবা। পোলাপানরে হগ্গলে মাস্তানের পোলা কইব।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেঁসে ফেলল অঞ্জন। হেঁসে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কয়টা পোলাপান তোমার?'

'অহনও একটাও না স্যার, হইব।'

'ভাল। কি করছ এখন?'

'অহনও কাম পাই নাই। খুঁজতাছি। কোন কাম থাকলে দিবেন স্যার। যা করতে কইবেন তাই করমু।'

কাজ দেয়ার কোন সুযোগ তার নেই। তবুও একেবারে নিরাশ করতে মন সায় দিল না অঞ্জনের। কোন সুযোগ এসে যেতেও পারে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পাওয়া যাবে তোমাকে?'

'আগারগাও বস্তি স্যার। চায়ের দোকানে আমার নাম কইলেই খবর দিব। বাবুল স্যার। বাবুল কইলেই চিনব।'

‘ঠিক আছে। এখন কিছু বলবে?’

একটু সুযোগ দিল অঞ্জন। আয় নেই, টাকাপয়সা চাইতে পারে। সেদিকে গেল না বাবুল নামের ছেলেটা। বলল, ‘না স্যার। আপনেরে দেইখ্যা দাড়াইলাম। এট্টু জানায়া রাখলাম। আসি স্যার। স্লামালেকুম।’

হাততুলে ছালাম করে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সে। মনে হয় বাড়ির দিকে। আরেকবার চারিদিকে নজর বুলিয়ে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন।

ছটায় কুদ্দুসের দেখা পেল না অঞ্জন। রমনার গেটের আশেপাশে বেশ কিছুক্ষন হাঁটাহাটি করার পর বুঝল তাকে পাওয়ার আশা নেই। হয়ত তার দেয়া দুশোটাকা নিয়েই সে কেটে পরেছে।

সকালে ওর ঘুম ভাঙল দরজায় টোকা শুনে। কাজের মেয়ে। বাইরে কেউ একজন তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে বাইরে এসে দেখল কুদ্দুস। বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে অমায়িক হাঁসি হাঁসল। অঞ্জন এগিয়ে গেল তার দিকে।

‘সকালে খাওয়া দাওয়া হয়েছে?’ ওর দিকে এগিয়ে এসে কুদ্দুস মুখ খোলার আগেই স্বাভাবিকভাবে জানতে চাইল অঞ্জন।

‘হইছে একটু।’ জানাল কুদ্দুস।

‘চল, আরেকটু হয়ে যাক।’

বলে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন। কোন কথা না বলে পিছু নিল কুদ্দুস। ওকে বাসায় নেয়ার ইচ্ছে নেই অঞ্জনের। নীলাদের নতুন কোন ঝামেলায় ফেলতে চায় না সে। আলোচনার জন্য কোন হোটেলে বসাই সুবিধাজনক হবে।

কিছুদুর হেঁটে গিয়ে কাছেই একটা হোটেলে বসে মাংশ-পরোটার অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করল ওরা। কথা বলছে না কেউ। এখনও অঞ্জন তাকে কোন প্রশ্ন করেনি। গতকাল কুদ্দুসকে না পেয়ে ধরে নিয়েছিল সে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তেমন না। নিজে থেকেই এসে খোঁজ করছে তার।

খাবার আসার সাথেসাথেই হাত লাগাল কুদ্দুস। ওকে খাওয়ার ধরন দেখে অঞ্জনের মনে হল সে ভাল খাবার খায়নি অনেকদিন। গ্রোগ্রাসে গিলছে। ওর খাওয়া দেখে আরো খাবার আনতে বলল অঞ্জন। নিজে কোনমতে একটু মুখে দিয়ে এককাপ চা দিতে বলল, সিগারেট ধরাল। কুদ্দুস তখনো খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

‘ছটায় রমনার গেটে থাকার কথা ছিল-’ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করল অঞ্জন।

‘ছয়টায়- আমি এইহানে খাড়া-’

‘কোথায়?’

‘আপনের বাড়ির কাছে। ওই লোকটা আছে, আমিও আছি। সে নড়ে না আমিও নড়ি না।’

‘ভাল। এখন বল কি দেখলে?’

খাওয়া শেষ করে পানি খেল কুদ্দুস। হাত মুছছে। সিগারেট খায় হয়ত, অঞ্জনকে বলে সাহস পাচ্ছে না। সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলে রাখা। কুদ্দুস তাকিয়ে দেখল, হাত বাড়াল না।

নিজের অভিজ্ঞতা বর্ননা করতে শুরু করল কুদ্দুস, ‘আপনে গেলেন, তারপর হাইটা হাইটা শিশুপার্কের সামনে দিয়া মোড়ে আইল, তারপর বাসে উঠল। আমিও উঠলাম। হ্যায় ফারামগেটে আইস্যা নামল, আমিও নামলাম। হ্যায় এদিক ওদিক কি জানি বিছরাইল, মনেহয় আপনারে খুঁজতাছে। না পাইয়া আবার বাসে উঠল। আসাদ গেটে নাইমা হাইটা আইল এইহানে-’

‘আচ্ছা।’

‘এইহানে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। আমি ওই চায়ের দোকানে খুটি গাইরা বইস্যা রইছি। একবার ফোনের দোকানে যাইয়া কারে জানি ফোন করল। আবার ফেরত আইল। সন্ধ্যা পার করল এমনে। তারপর আবার গিয়া ফোন করল। সারাদিনে কিছু খায় নাই। আমিও না খাওয়া। ফোন কইরা আবার আসাদগেটে গিয়া বাসে উঠল। মিরপুর এক নম্বর নাইম্যা মাজার রোডের দিকে হাঁটতে লাগল।’

‘তারপর?’ কুদ্দুস থামায় জিজ্ঞেস করতে হল অঞ্জনকে।

এবারে কথা না বলে মাথা নিচু করে থাকল কুদ্দুস। অঞ্জন বুঝল সে এরবেশী কিছু করতে পারেনি। সম্ভবত লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছে সেখানে।

‘আজ দেখা হয়েছে ওর সাথে?’

‘না বস, আইসাই আগে খোঁজ লইছি। অহনো আহে নাই।’

‘আচ্ছা, দেখলে আবার পেছনে লাগবে। এবার যেন না হারায়। ওর নাম কি, ঠিকানা কি জানবে। দোকান থেকে ফোন করলে সেখানে যেয়ে নাম্বার জানবে। রাস্তায় কারো সাথে কথা বললে তারও খোঁজ নেবে। ঠিক আছে?’

’জ্বে বস।’

ওকে আরো দুশো টাকা দিল অঞ্জন। টাকাগুলো নিয়ে সার্টের ভেতরের পকেটে রাখল কুদ্দুস।

‘আমাকে এখানে পাওয়া যাবে জানলে কিভাবে?’ প্রশ্ন করল অঞ্জন।

‘আপনের পিছনে লাগছে এইডা তো বুজছি বস। বাকিডা হিসাব।’ নিজেকে বুদ্ধিমান হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করল কুদ্দুস।

‘আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে বসে থাকো কিছুক্ষন। রাস্তার দিকে চোখ রাখো।’

উঠে বিল দিয়ে বের হল অঞ্জন। একেবারে বাইরে যাওয়ার প্রস'তি নিয়ে আসেনি সে। বাড়ির কাউকে জানায়নি কিছু। আবার বাড়িতে ঢুকল। কুদ্দুস কাজ করছে ঠিকমতই।

বাড়িতে ঢুকে কাজের মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাকে জানিয়ে দিল সে বাইরে নাস্তা খেয়েছে। তারপর আবার বের হয়ে হেঁটে হেঁটে মোড়ে এসে দাঁড়াল সে। কাজ গুছিয়ে করতে হবে তাকে। ওই লোকগুলো নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়েই তার পিছনে লেগেছে। কেউ একজন বস রয়েছে যে সবসময় খোঁজ রাখছে। তাকেই টেলিফোনে রিপোর্ট করছে পিছনে লাগা লোক। যে কোন সময় আক্রমন করা হতে পারে তাকে। কেন তা সে এখনো জানে না।

তাকে কিছু একটা করতে হবে। তাকে জানতে হবে ওই লোকগুলোর উদ্দেশ্য। জানতে হবে নিজের পরিচয়। কোনটা বেশী দরকার ভেবে পেল না সে। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কই বা কি তাও ভেবে পেল না।

রেবেকার সাথে কথা হয়েছিল বড়বাজারে খোঁজ নেয়ার। সেখানেই ঘটেছিল দুর্ঘটনা যা থেকে সে নিজের পরিচয় ভুলে গেছে। হয়ত কিছু জানা যেতে পারে সেখানে। সেদিকে যাওয়াই ঠিক করল সে।

বড়বাজার আসলেই বিশাল দোকান। রেবেকা বলেছে এখানকার লোকেরাই তাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। এদের নিজেদের গাড়িতে। সম্ভবত এদেরই কেউ তার পকেট থেকে বের করে নিয়েছে সবকিছু। টাকাপয়সা তো বটেই, তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে এমন সবকিছুই।

দোকানে এসে দেখল মাত্র দোকান খুলেছে। এখনো লোকজন আসতে শুরু করেনি। কর্মচারীরাও নিজের নিজের যায়গায় পৌছেনি ঠিকমত। দোকানে ঢুকে ম্যানেজারের খোঁজ করল অঞ্জন। ম্যানেজার বসে দোতলায়। অল্পবয়সী। বোধহয় অঞ্জনের চেয়েও ছোট হবে। দেখে চিনতে পারেনি অঞ্জনকে। নিজের পরিচয় দিল সে।

‘আমার নাম অঞ্জন। কদিন আগে এখানে একটা গন্ডগোলে আমি আহত হয়েছিলাম। চিনতে পারছেন?’

সাথেসাথে উঠে দাঁড়াল ম্যানেজার। হাত বাড়াল হ্যান্ডশেক করার জন্য। হ্যান্ডশেক করে বসার ইঙ্গিত করল সামনের চেয়ারে। ব্যস্ত হয়ে চায়ের অর্ডার দিল। তারপর মনোযোগ দিল অঞ্জনের দিকে।

জিজ্ঞেস করল, ‘ক্যামন আছেন?’

‘ভাল।’

সময় নষ্ট করল না অঞ্জন। কাজের কথায় গেল সে, ‘আমাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল বোধহয় আপনাদের লোক-’

‘হ্যাঁ, আপনি আমাদের জন্য তারচেয়ে বেশি করেছেন।’ বিনয় দেখাতে চেষ্টা করল সে।

‘ভাল। আমার একটা বিষয় জানা দরকার। খুব জরুরী। আমাকে যারা গাড়িতে তুলেছে বা কাছাকাছি ছিল তাদের কেউ আমার ঘড়ি আর পকেট থেকে জিনিষপত্র বের করে নিয়েছে। খুব দরকারী কাগজপত্র ছিল। আমার সেগুলো দরকার। খোঁজ করে দেখবেন কি সেটা কে নিতে পারে?’

মুহূর্তে মুখের হাঁসি মিলিয়ে গেল ম্যানেজারের। অপলক চেয়ে আছে তারদিকে। তারপরই মাথা নিচু করল। ঢোক গিলল একবার। দেখে অঞ্জনের একবার মনে হল হয়ত সে নিজেই করেছে কাজটা।

ম্যানেজার সামনের গ্লাশ থেকে পানি খেল।

তাকে আস্বস্ত করল অঞ্জন, ‘টাকা-পয়সা কিংবা ঘড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনা। ওগুলো রেখে দিলে আমার কোন আপত্তি নেই। অন্য কাগজপত্র গুলো আমার দরকার।’

মাথা নিচু করে বসে থাকল ম্যানেজার। সামলে নিচ্ছে। প্রস'তি নিচ্ছে কি করবে কিংবা কিভাবে উত্তর দেবে। এরই মধ্যে একজন ট্রেতে করে চা দিয়ে গেল। চা আসায় ইশারায় চা খেতে বলল অঞ্জনকে।

অল্পবয়সী হলেও লোকটা উচ্চশিক্ষিত, ধারনা করল অঞ্জন। পরিস্থিতি সামলে নিল সহজেই। রীতিমত স্বাভাবিকভাবেই কথা বলল যখন মুখ খুলল।

‘আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমাদের এখানে এধরনের ঘটনা ঘটার জন্য। আমার মনে হয় আরো কিছু ঘটনার কথা আপনার জানা নেই।’ থেমে একটু সময় নিল ম্যানেজার, ‘এখানকার একজন কর্মচারী, দুর্ঘটনার পরই ওর হাতে দামী একটা ঘড়ি দেখে অন্যরা। খুব দামী ঘড়ি, লক্ষ টাকার মত দাম। জিজ্ঞেস করলে বলে রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে। ওটা সম্ভবত আপনার। পরদিন থেকে ও কাজে আসেনি। গতকাল সকালে ওর লাশ পাওয়া গেছে। মেরে পানিতে ফেলে দিয়েছে কেউ। ঘড়িটা তখনও হাতে ছিল। ওটা পুলিশের কাছে আছে।’

হতভম্ভ হয়ে গেল অঞ্জন।

তার জিনিষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই সেই লোক সরিয়েছিল তার সবকিছু। টাকাপয়সা এবং ঘড়ি। থানায় খোঁজ করলে যে ঘড়িটা পাওয়া যাবে সেটা তারই।

সে খুন হল কেন?

তার হাতে ঘড়িটা ছিল। লক্ষ টাকা দামের ঘড়ি। সেটা খুনি নেয়নি। সে কি বুঝতে পারে নি এটা দামী? না-কি সে আরো দামি কিছু খোঁজ করেছে?

বিষয়টা ছেলেখেলার পর্যায়ে নেই। খুনের পর্যায়ে পৌছে গেছে। খুঁজে বের করেছে ওই লোককে, খুন করেছে। তারমানে প্রয়োজন হলে খুন করবে তাকেও।

ম্যানেজারকে কোনমতে বুঝ দিয়ে বাইরে বের হল অঞ্জন। ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে।

একজন দুজন না, পুরো একটা দল কাজ করছে ওকে ঘিরে। সবসময় চোখে চোখে রাখছে কেউ, অন্যরা অন্যভাবে লেগে রয়েছে। টেলিফোনে যোগাযোগ রাখছে কারো সাথে। একজনকে এরই মধ্যে খুন করেছে, এরপর কি হবে জানা নেই ওর।

কিভাবে জানা যায় এদের পরিচয়? নীলার বাবা?

তারসাথে যোগাযোগ করা দরকার। ভদ্রলোক একবারও তার সামনে পরেননি। যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলেছেন তাকে। বাড়ি ফেরেন অনেক রাতে। সকালে সে ওঠার আগেই বেরিয়ে যান। অঞ্জন নিশ্চিত ফ্যাঁসফেসে গলার লোকের সাথে কথা হয়েছে তারই। ফ্যাঁসফেসে গলার লোকটা তার শত্রু যারা তার পিছনে ঘুরছে তাদের একজন। হয়ত স্তেই বস। তাকেই টেলিফোনে রিপোর্ট করছে তার পিছনে ঘোরা লোক।

নীলার বাবার অফিস মতিঝিল শাপলা চত্বরের কাছে, এটুকুই শুনেছে নীলার কাছে। ঠিকানা, ফোন নাম্বার জানা নেই। এমনকি কি অফিস তাও জানা নেই। বাসায় গিয়ে ঠিকানা নেয়া দরকার। তারসাথে বাসায় আলাপ করার চেয়ে অফিসে আলাপ করা সহজ হবে।

বাড়ির কাছে এসে রাস্তায় জটলা দেখে দাঁড়াল অঞ্জন। একটু দুরে কয়েকজন পুলিশ। উৎসুক মানুষের ভীড়। লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কি ঘটেছে। তারপর জটলার দিকে কয়েকপা এগিয়ে এসে হোটেলের ছেলেটাকে দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল তাকেই।

‘এই, কি হয়েছে রে-’

‘একসিডেন্ট। একজন লোকেরে গাড়ি চাপা দিছে। দিয়াই পালাইছে।’ উত্তর দিল সে।

‘হুঁ, বেঁচে আছে?’

‘মনেঅয় বাঁচব না। এক্কেরে কাহিল মানুষ।’

‘দেখেছিস ভাল করে?’

‘হ, হলুদ জামা গায়ে। মোটা চশমা।’

কুদ্দুস! কুদ্দুসের গায়ে ছিল হলুদ সার্ট। চোখে পুরু চশমা। রোগাপাতলা স্বাস্থ্য। এখানেই ছিল সে। ওই লোক এখানে এলে তার ওপর নজর রাখবে।

ওরা সে সুযোগ দেয়নি তাকে। ইচ্ছে করেই গাড়িচাপা দিয়েছে তাকে। কুদ্দুস যথেষ্ট সাবধানী। কখনোই অসাবধানে গাড়ির নিচে চাপা পরবে না।

একবার হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেয়ার কথা ভাবল অঞ্জন। তার কথা শুনতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে কুদ্দুস। হয়ত জীবন দিতে হয়েছে।

কিন' এই মুহূর্তে তার নিজের বিপদ আরও বেশী। বড়বাজারের লোকটা খুন হয়েছে, এখন কুদ্দুস। সাবধান না হলে খুন হবে সেও।

সেটা হতে পারে যে কোন সময়।

চিন্তা করতে করতে হেঁটে এসে বাড়িতে ঢুকল সে। ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে এখলাস সাহেবের কার্ডটা নিয়ে পকেটে রাখল। সেলিমকে একবার খোঁজ করলে হয়। ওকেও জানানো দরকার মারাত্মক ঘটনা ঘটছে চারিদিকে। তাকে সাবধান করা দরকার। টেলিফোন ডিরেক্টরীটা হাতে নিয়ে বিছানায় বসল অঞ্জন।

বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

নীলা। নীলার কথা ভুলেই গিয়েছিল অঞ্জন। প্রতিদিন সকালে বারান্দায় বের হয়ে প্রথমেই দেখা হয় ওর সাথে। আজ হয়নি। কাজের মেয়ে দরজায় শব্দ করে ডেকেছে তাকে।

'হ্যাঁ, নিলু, ভেতরে এস।'

পর্দা সরিয়ে নীলা তাকাল। চমকে উঠল অঞ্জন ওকে দেখে। চোখ ফুলে আছে। চোখের নিচে কালি। একেবারে বিষন্ন চেহারা। আগের পরিচিত নীলার সাথে কোন মিলই যেন নেই।

'ভেতরে এস। কি হয়েছে? মন খারাপ কেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অঞ্জন। ঘরে ঢুকে টেবিলের কাছে দাঁড়াল নীলা। অনেকক্ষন কোন কথাই বলতে পারল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'আমার খুব মন খারাপ।' একসময় কোনমতে বলল নীলা।

একেবারেই অন্যরকম লাগছে নীলাকে। তাকে সবসময় হাসিখুশী দেখে এসেছে অঞ্জন। সেই হাঁসি নেই এখন। হঠাৎ করেই যেন বয়স বেড়ে গেছে ওর। নিশ্চয়ই ঘুমায়নি সারারাত। দুঃশ্চিন্তা করেছে কিছু নিয়ে। গতরাতে খাবার সময়ও একেবারে স্বাভাবিক ছিল।

এমন কি ঘটল এই সময়ে?

'বস।'

কথা না বলে চেয়ার টেনে বসল নীলা। বসে থাকল মাথা নিচু করে। অপেক্ষা করে বসে থাকল অঞ্জন। নীলা মুখ খুলছে না।

'কি হয়েছে বলোতো?' যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল অঞ্জন।

তারপরও সাথেসাথে উত্তর দিল না নীলা। অনেকক্ষন পর মাথা তুলল সে, 'আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

শুনে অবাক হল অঞ্জন। যাকিছু ঘটনা ঘটেছে সবই বাইরে। বাড়িতে এমন কি ঘটল যে তার বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওই ছোকরাগুলো কোন হুমকি দিয়েছে? নাকি বাইরের বিপদ ঘরেও এসে ঢুকেছে? এমনিতে সে খুব একটা বাইরে যায় না। বাইরে যাওয়া বন্ধ মানে হয়ত কলেজে যাওয়া বন্ধ। কয়েক মাস পর ওর পরীক্ষা। সেকারনেই এতটা মন খারাপ ওর।

'কে বলেছে বাইরে যাওয়া বন্ধ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাবা।'

'কেন?'

'জানি না। বলেছে বাইরে কোথাও যাওয়া যাবে না। কলেজেও না।'

ঠিকই অনুমান করেছে অঞ্জন। বাইরের বিপদ ঘরে এসে পৌছেছে। বিপদ ঘনাচ্ছে চারিদিক থেকেই। চারিদিক থেকে ঘিরে ধরছে ওকে। সরাসরি তার ওপর আক্রমন করে সুবিধে করতে পারেনি। কোনমতে সে ফসকে গেছে। অথবা তারা শারীরিকভাবে আক্রমন করতে চায় না ওকে। অন্যভাবে জাল গুটিয়ে আনছে তার চারিদিকে। নীলার বাবা কথা শোনেননি, সেজন্যই ভয় দেখিয়েছে নীলার ক্ষতি করবে। মেয়েকে নিয়ে ভয় দেখালে বাবা-মা কথা শুনতে বাধ্য।

ওই ছোকরাগুলোর কাজ না এটা। তাহলে এক কথায় বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিত না নীলার বাবা। এটা সেই ফ্যাঁসফেসে গলার লোকটার কাজ। অঞ্জন নিশ্চিত, ওর পেছনে ঘোরা সব লোক এখলাস সাহেবের হয়ে কাজ করছে না। এখলাস সাহেব হয়ত আসলেই সুলতানকে সরে যেতে বলেছেন। আর কাউকে লাগানো প্রয়োজন মনে করেননি।

এরা তার পিছনে এভাবে লাগল কেন? কি চায় তার কাছে? কেন সেটা সরাসরি তাকে বলছে না?

আপাতত নীলাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে। এভাবে একজনের পড়াশোনার ক্ষতি মেনে নেয়া যায় না। তাকে শান্তনা দিতে চেষ্টা করল অঞ্জন, 'মন খারাপ কোর না নিলু, তুমি কলেজে যেতে পারবে। আমি কথা দিচ্ছি তোমার কলেজে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করব।'

নীলা কতটা আস্বস' হল বোঝা গেল না। কোন কথা বলল না। ওকে বুঝিয়ে ভেতরে পাঠাল অঞ্জন। ওর বাবার ঠিকানা না নিয়েই বাইরে বের হল। অন্যভাবে এগোতে হবে তাকে। এখলাস সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে মোড় পর্যন্ত আসতেই একটা পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়াল ওর পাশে। তিনজন পুলিশ দ্রুত নেমে ঘিরে ধরল ওকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অঞ্জন। দলের নেতা এসে সামনে দাঁড়াল।

'আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখল অঞ্জন। আগের ভীড় এখনো কমেনি। দুরে দাঁড়িয়ে লোকজন আগ্রহ নিয়ে দেখছে কি হয়। নিজেরা কে কি দেখেছে তার বর্ননা দিচ্ছে। তার ওপর নতুন ঘটনা ঘটছে তাদের চোখের সামনে।

এদের ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে আপত্তি করে লাভ হবে না। কেউ একজন এদেরকে বলেছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। হয়ত কেউ বলেছে যে একসিডেন্ট করেছে তারসাথে হোটেলে বসে খেয়েছে সে।

কথা বাড়াল না অঞ্জন। এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। দেখা যাক। এখলাস সাহেব যদি একপক্ষে না থাকেন তাহলে আরেক পক্ষে তাকে পাওয়া যাবে।

থানায় একটা বেঞ্চে অনেকক্ষন একাএকা বসে থাকতে হল ওকে। আশেপাশে ঘোরাফেরা করা লোকজন ঘুরেও তাকাল না তার দিকে। তারপর একসময় তাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা ঘরে। একজন লোক বসে রয়েছে সেখানে। এই লোকই থানার সবকিছু দেখে ধারনা করল সে। উচু একটা চেয়ারে বসে আছে। অঞ্জন বসতেই হাতে একটা পেনসিল উচু করে ধরে জেরা করার মত প্রশ্ন শুরু করল, 'নাম?'

এতটুকু সময় নষ্ট করল না অঞ্জন। সরাসরি কাজের কথায় গেল সে। বলল, 'একটা ফোন করব।'

মুহূর্তের জন্য রাগতভাব দেখা গেল লোকটার চেহারায়। থানায় এসে সকলেই একথা বলে। পরিচিত ক্ষমতাশালী কাউকে টেলিফোন করে। সময় সময় রীতিমত বিপদে পড়তে হয়।

অঞ্জনের পোষাক চেহারা দেখে বোঝার চেষ্টা করল তার সামাজিক অবস্থান। পরিচিত কোন কেউকেটা থাকলে বিপদে পরতে হবে তাকেই। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না, এটাই যেন মনে করল সে।

'কোথায় ফোন করবেন?' শান্তভাবেই পরবর্তী কথা বলল সে।

অঞ্জন বলল, 'নাম্বার দিচ্ছি, আপনিই কল করুন।'

পকেট থেকে কার্ড বের করে টেবিলে রাখল অঞ্জন। এমডি এখলাসউদ্দিন আহমাদ। টেবিল থেকে কার্ডটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল লোকটা। মুহূর্তেই তারমধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখল অঞ্জন। মুখের ভাব পাল্টে গেছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে কার্ডের দিকে। লক্ষ্য করল কার্ড ধরা হাত কাঁপছে। প্রানপনে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে অফিসার।

এতটা কাজ হবে সে নিজেও ভাবেনি।

একসময় অঞ্জনের দিকে ফিরল অফিসার, 'চা খাবেন? একটু চা খান।'

'ফোনটা করুন। আমার কথা বলা দরকার।' শান্তভাবে তাকে বলল অঞ্জন।

'করছি স্যার, চা-টা খেয়ে নিন। এই, চা আর কি আছে আন-'

হঠাৎ করেই স্যার হয়ে গেল অঞ্জন। বোঝা যাচ্ছে এখলাস সাহেবকে যমের মত ভয় করে। বড় অফিসার হিসেবে যতটা হওয়া উচিত, মনে হচ্ছে ভয়টা তারচেয়ে বেশী। অঞ্জনের মনে পড়ল সে নিজে একবারও ভাল করে দেখেনি আসলে এখলাস সাহেবের পদ কি। কি লেখা আছে কার্ডে।

টেবিল থেকে একটা রুমাল নিয়ে সেটা দিয়ে ঘাড় মুছল লোকটা। অঞ্জন সোজা তাকিয়ে আছে তারদিকে। লোকটা সময় নিচ্ছে। একটু পর তাকাল অঞ্জনের দিকে।

'স্যার, একটা কথা বলতাম।'

রীতিমত প্রস্তাব দেয়ার মত করেই বলল সে।

কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ না করার চেষ্টা করল অঞ্জন। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

সে আবার কথা শুরু করল, 'বলছিলাম কি স্যার, আমাদের সবসময়ই খারাপ মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয় স্যার। আর এরা, যাকে বলে একেবারে মুর্খ। যাকে তাকে ধরে আনে আর আমাদের জীবন নিয়ে টানাটানি। স্যার আমি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি আপনার কাছে মাফ চেয়ে যাবে। আপনি কিছু মনে রাখবেন না স্যার।'

হাসিহাসি মুখ ওসির। খুব ভালভাবেই সে প্রস্তাবটা দিতে পেরেছে। তার নিজের কোন দোষ নেই এখানে। টেবিলে চা আর বিস্কুট দিয়ে গেছে একজন। এতটুকু সময় নষ্ট করেনি।

হেঁসে টেবিলে রাখা প্লেটটা দেখাল অফিসার, 'বিস্কুটটা খেয়ে দেখবেন স্যার। খুব ভাল বানিয়েছে। নতুন বের করেছে।'

'আপনি এখলাস সাহেবের কাছে কল করুন। আমার নাম বলে বলুন কথা বলব। আমার কথা বলা দরকার।'

শান্তভাবেই কথাগুলো বলল অঞ্জন। এখলাস সাহেবের সাথে কথা বলাটাই খুব জরুরী হয়ে পরেছে তার জন্য।

'জ্বি স্যার, অবশ্যই স্যার।' ফোন হাতে নিল ওসি, 'আপনার নাম কি বলব স্যার?'

'অঞ্জন।'

অঞ্জন লক্ষ্য করল নাম্বার টেপার জন্য কার্ডের দিকে তাকাচ্ছে না একবারও। মনেহয় নাম্বার মুখস্ত। হাত স্থির রাখতে পারছে না। পুরনোদিনের সেটের মত ঘুরিয়ে ডায়াল করতে হলে বোধহয় নাম্বার ভুল করত। রিং হতে সাথেসাথেই ওদিক থেকে কেউ ফোন ধরল।

'স্যারকে বলুন রঞ্জন সাহেব কথা বলবেন-'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই হ্যান্ডসেটটা অঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিল। অঞ্জন সেটা নিয়ে কানে লাগাল। তখনও এখলাস সাহেবের কাছে লাইন পৌছেনি। একটু পরই তার মোলায়েম কণ্ঠ শোনা গেল।

'হ্যালো।'

'হ্যালো, স্লামালেকুম। আমি অঞ্জন।'

'হ্যাঁ, অঞ্জন কেমন আছো?'

আগেরবার আপনি করে বলেছিলেন, এখন তুমি বলছেন। খুব অবাক হল না অঞ্জন। ভদ্রলোক বয়সী। তারজন্য অনেক করেছেন।

'জ্বি ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ, ভাল। তুমি কোথা থেকে বলছ?'

'থানা থেকে, মোহাম্মদপুর থানা।'

'থানা!'

গলার স্বর যেন পাল্টে গেল এখলাস সাহেবের। অঞ্জন দেখল সামনের পুলিশ অফিসার বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে যেন। অঞ্জনের রাগ কমে গেল তার অবস্থা দেখে।

'না, তেমন কিছু না। ভাবলাম এখান থেকে ফোনটা করি। আপনার সাথে একটু আলাপ ছিল।'

‘আচ্ছা, টেলিফোনে বলা যাবে? নাহলে বাসায় এসো। আটটার দিকে আসতে পারবে?’

‘জ্বি, ঠিক আটটায় আসব।’

‘ঠিকানা আছে তো?’

‘জ্বি।’

‘আচ্ছা, দেখা হবে।’

ফোনটা নামিয়ে রাখল অঞ্জন। সামনের লোকটা যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। অঞ্জন তার নামে কোন অভিযোগ করেনি। হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে থাকল অঞ্জনের দিকে। অঞ্জন কার্ডটা তুলে পকেটে রাখল। চায়ের কাপ নিয়ে মুখে দিল। মনে হচ্ছে মিষ্টি সরবত। ঠান্ডা হয়ে গেছে।

‘চা-কি ভাল বানিয়েছে স্যার?’

বোঝা যাচ্ছে ‘না’ বললে সেখানেও একটা ঝড় বয়ে যাবে। তার সামনেই। কোনমতে আরেকটু মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল অঞ্জন। এর মনে আরেকটু ভয় ধরানো দরকার।

‘এভাবে বিনাকারনে কাউকে ধরে আনবেন না। বিপদে পরবেন।’ শান্তভাবে কথাটা বলেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল অঞ্জন।

‘স্যার, গাড়ি-’

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিল অঞ্জন। ঘুরেও তাকাল না। হেঁটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এরা তাকে থানায় এনেছিল সম্ভবত কুদ্দুস সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য। সেকথা বেমালুম ভুলে গেছে।

বাইরে এদিক ওদিক ঘুরে কয়েক ঘন্টা সময় কাটাল অঞ্জন। লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল এখনো ফলো করছে কিনা। দেখতে পেল না। কুদ্দুসকে নিশ্চয়ই সে নিজে গাড়ি চাপা দেয়নি, দলের অন্য কেউ করেছে কাজটা। কুদ্দুস তার পিছনে মীরপুর পর্যন্ত গেছে সেটা জেনে ফেলেছে ওই লোক। দেখে যতটা বোকা মনে হয় ততটা বোকা না সে। বুঝলেও কুদ্দুসকে জানতে দেয়নি। এখনও হয়তো অন্য কোনভাবে চোখ রাখছে ওর ওপর।

রেবেকা তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে চেয়েছিল। সেটা খুবই জরুরী। ওষুধ খেয়ে কোন পরিবর্তন দেখতে পায়নি সে। চিকিৎসাবিজ্ঞান যদি অন্য কোনভাবে তার কোন উপকার করতে পারে তাহলে সেটা করা প্রয়োজন যত দ্রুত করা সম্ভব। অঞ্জনের জানা দরকার তার পরিচয়। এই লোকগুলি কেন এসব করছে জানতে হবে তাকে।

সন্ধ্যায় হাসপাতালে রেবেকার সাথে দেখা করল অঞ্জন। রেবেকা তাকে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলেন তবে কোন আশার বানী শোনাতে পারলেন না। তাকে খুব চিন্তিত বলেও মনে হল না। একটু একটু যখন মনে পরছে

তখন বাকিটা দ্রুতই মনে পরবে। এখানে জোরাজুরি করার কিছু নেই। সময়মত খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে বললেন তিনি।

ঠিক আটটায় এখলাস সাহেবের বাড়ির গেটে পৌছাল অঞ্জন। সরকারী কোয়ার্টার না, সাধারন আবাসিক এলাকায় বাড়ি। বিশাল আকারের পুরনো তিনতলা বাড়ি। গেটে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গোড়ালী ঠুকে স্যালুট করল গেটের পুলিশ। অবাক হল অঞ্জন। তাকে দেখেই চিনেছে। অথবা কেউ জানিয়ে রেখেছে তারকথা। রীতিমত ভিআইপি হয়ে গেছে সে।

'স্যার ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছেন।' একজন বলল আস্তে করে।

ভিতরে ঢুকতে একজন সাথেকরে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বারান্দায় উঠে খোলা দরজা দেখে সেদিকে পা বাড়াল অঞ্জন। এখলাস সাহেব সোফায় বসে খবরের কাগজ পরছেন। সাদা একটা হাতকাটা ফতুয়া গায়ে। একেবারে সাধারন পোষাকে অন্যরকম লাগছে তাকে। রোগা এবং বয়স বেশী মনে হচ্ছে। অঞ্জন ঢুকতেই মুখ তুলে তাকালেন।

'হ্যাঁ অঞ্জন, এসো।' কাগজটা ভাঁজ করে রাখলেন পাশে, 'বসো।'

কাছাকাছি আরেক সোফায় বসল অঞ্জন।

'তুমি মোহাম্মদপুরে আছো বোধহয়-' কথা শুরু করলেন তিনি।

অঞ্জন বলল, 'জ্বী, আমার এক বন্ধুর বাড়ি। ওখানে একটা সমস্যার বিষয়ে আপনাকে জানানো দরকার মনে করছি।'

প্রশ্ন করলেন না এখলাস সাহেব। তাকিয়ে থাকলেন।

অঞ্জন বলল, 'ওদের এক মেয়ে কলেজে পড়ে। তাকে নিয়ে কোন বিষয় হয়েছে। কেউ হুমকি দিয়েছে। ও কলেজে যেতে পারছে না।'

এখলাস সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'কি ধরনের হুমকি?'

অঞ্জন বলল, 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। ওর বাবার সাথে কথা বলার সময় একদিন টেলিফোনে আমি কিছু কথা শুনে ফেলেছিলাম। ফাঁসফেঁসে গলায় কে যেন বলল সে দেখে নেবে।'

এখলাস সাহেব বললেন, 'পরিচয় জানো না?'

অঞ্জন বলল, 'ওর বাবা হয়ত জানেন। আমি সরাসরি উনার সাথে আলাপ করিনি, আমার কথায় খুববেশী নিশ্চয়তা হয়ত পাবেন না।'

একটু ভাবলেন এখলাস সাহেব। তবে সিদ্ধান্ত নিলেন দ্রুতই। বললেন, 'বুঝেছি। তুমি ফোন নাম্বারটা লিখে দাও আমি রাতে ফোনে আলাপ করব। তুমি বলে দিও পরিচয় জানলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজতে ঢুকাব। আর কলেজে যেতে পারে। আমি লোক রাখার ব্যবস্থা করব।'

একজন লোক এসে ট্রে রেখে গেল। ছোট প্লেটে বিস্কুট আর পটে চা। তিনি নিজেই চা ঢাললেন। অঞ্জনের দিকে এগিয়ে দেয়ায় সে কাপটা ধরল।

চুপ করে থাকল অঞ্জন। নিজে বোধহয় চা খাবেন না। এখলাস সাহেব হাত বাড়িয়ে কাগজটা ধরেও আবার রেখে দিলেন। চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে। কি যেন বলবেন কি বলবেন না ভাবছেন। তার চিন্তায় বাঁধা দিল না অঞ্জন। চায়ের কাপ মুখে তুলল। কোন কথা না বলে চা খেতে থাকল।

তিনিও অনেকক্ষন চুপ করে বসে থাকলেন। অঞ্জন চা খাওয়া শেষ করার পরও কোন কথা বললেন না। খবরের কাগজটাও হাতে নিলেন না। মাথা নিচু করে থাকলেন অনেকক্ষন।

তারপর একসময় অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মুখ খুললেন তিনি। আপনমনেই বললেন, 'জানো অঞ্জন, এধরনের কথা সবসময় এত শুনি যে মনে দাগ কাটে না। মনেহয় আমাদের যা করার তাতো করছিই। এরবেশী কি-ই বা করতে পারি। এটাই স্বাভাবিক। কিছু কিছু ঘটনা ঘটবেই। এখন আমি নিজেই কিছুটা বুঝি। সেদিন তুমি না থাকলে আমার মেয়ে আর নাতনীর যে কি হত ভাবলে আমি কেঁপে উঠি। ও, ওদের না দেখে অবাক হচ্ছো বোধহয়। ওরা বেড়াতে গেছে। জেসমিনের দাদাবাড়ি ফরিদপুর, ওখানে কদিন থেকে আসবে- তোমার কি শরীর খারাপ?'

উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে। অঞ্জন চোখ বন্ধ করে মাথাটা চেপে ধরেছে। আবার সেই ব্যথাটা। সে ভুলেই গিয়েছিল ব্যথার কথা। মাথার মধ্যে পাক দিচ্ছে। কিছু একটা মনে পরছে ওর। মনে পরল না। আবার হারিয়ে গেল ওর সামনে থেকে।

'হঠাৎ হঠাৎ মাথায় ব্যথা করে ওঠে। কিছু দেখতে পাই না।' বলল অঞ্জন।

স্থিরভাবে তারদিকে চেয়ে আছেন এখলাস সাহেব। বোঝার চেষ্টা করছেন তাকে। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল অঞ্জন। এখলাস সাহেবকে আস্বস্ত করল সে, 'ডাক্তার বলেছে এমন হতে পারে। কদিনেই সেরে যাবে।'

'তোমার আরো রেষ্ট দরকার। ওখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো?' আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করলেন এখলাস সাহেব।

সাথে সাথে কথা কাটল অঞ্জন, 'না-না। ওনারা খুব ভাল। যাকিছু করা সম্ভব সবই করেন।'

এখলাস সাহেব বললেন, 'যাওয়ার সময় আমার গাড়িটা নিয়ে যেও। তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে।'

নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে অঞ্জন। ঝড়ের ঝাপটা এসেই চলে গেছে। এখলাস সাহেবের সাথে তার সরাসরি কিছু আলাপ করা দরকার। এটাই সময়। উনি তার শত্রুনন এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে অঞ্জন। নীলার বাবাকে হুমকি দেয়ার মুল কারন হয়ত সে, নীলা না। সে এতে জড়িয়েছে জেসমিনকে অপহরন চেষ্টার সময় থেকে। সে বিষয়টিও জড়িয়ে আছে এরই সাথে। সরাসরি সেই কথায় গেল সে।

'জেসমিনকে অপহরন করার কি বিশেষ কোন কারন আছে?' সোজা এখলাস সাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল অঞ্জন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন এখলাস সাহেব। সময় নিচ্ছেন। ভাবছেন তাকে জানাবেন কি জানাবেন না। তার কাজের সব কথা সবাইকে বলা যায় না।

একে বোধহয় বলা যায়। একসময় অঞ্জনকে বলাই ঠিক মনে করলেন তিনি। উত্তর দিলেন অঞ্জনের প্রশ্নের। বললেন, 'তুমি যদি খবরের কাগজ পড় তাহলে এই গ্রুপটা সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারবে। এরা আর্মস স্মাগলিং করে। পিস্তল থেকে শুরু করে এসল্ট রাইফেল পর্যন্ত। হয়তো আরো বড় অস্ত্রও করে। কোথা থেকে আনে, কোথায় যায় এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কিছুদিন আগে দলের বড় একজন ধরা পরেছে। এখনও মুখ খোলেনি। তবে সে অনেককিছু জানে। একে ধরার পিছনে আমার বড় রকমের ভুমিকা ছিল। এখনও বিষয়টা আমার দায়িত্বে। ওকে ধরার পর থেকেই ওরা সবরকম ভাবে চাপ সৃষ্টি করছে যেন সে কিছু বলার সুযোগ না পায়। তোমাকে সবকিছু ডিটেল বলা সম্ভব না। আমার ধারনা জেসমিনকে অপহরন চেষ্টাও ওদেরই কাজ। আমার ওপর চাপ দেয়া।'

'তাহলে অন্যভাবেও সে চেষ্টা করতে পারে-' বলতে চেষ্টা করল অঞ্জন।

'করছে।' বললেন তিনি, 'যতরকম ভাবে করা সম্ভব সবই করছে। এর সাথে এত শক্তিশালী ব্যক্তি জড়িত আছে যে প্রয়োজনে আমাকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। আমার এখান থেকে পেছানোর উপায় নেই। তার পরিচয় আমি প্রকাশ করব। সেজন্য যা করতে হয় করব। আমার বিশ্বাস আমি জাল গুটিয়ে আনতে পারব।'

সুলতানকে তার নিরাপত্তার জন্যই লাগানো হয়েছিল, নিশ্চিত হল অঞ্জন। সে সেকাজেরই উপযোগী। হয়ত বিশেষভাবে তাকে বেছে নিয়েছেন তিনি। হয়ত তার মত আরো কয়েকজনকে। পুলিশের লোকের মধ্যে দুর্নীতির অনেক কথা প্রচলিত। কোন অভিযানের খবর পুলিশ পৌছার অনেক আগে পৌছে যায় ওদের কাছে। পুলিশ অভিযানে কোন ফল পায় না। তিনি সেটা তারচেয়েও ভালভাবে জানেন। নিশ্চয়ই এদেরকে এড়িয়ে কাজ করেন।

কিন' সুলতানকে তার পিছনে লাগানোর প্রয়োজন হল কেন? তিনি কি আশংকা করছেন কেউ তার পিছনেও লাগবে? দলের চারজন মারা গেছে, তারা প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা করতেই পারে। তারমানে তার ওপর হামলা আসতে পারে এটা তিনি জানেন। তা থেকে রক্ষা করা।

নাকি অন্যকিছু। আরো বেশী কিছু। যদি কেউ হামলা করতে আসে তার নাগাল পাওয়া। সেটা ওই দলের নাগাল পাওয়ার সুত্র। তাকে রক্ষা করার বিষয়টা হয়ত গৌন। হয়ত সে একটা টোপ এখানে।

অঞ্জনের একবার ইচ্ছে হল তার পিছনে ঘোরা লোকের কথা জানাতে। কুদ্দুসের কথা জানাতে। তারপর মনে হল উনি হয়ত সেটা জানেন। সে এবিষয়ে কোন কথা বলল না। খোঁজটা তাকেই নিতে হবে।

আর কিছুক্ষন বসে থেকে সাধারন কিছু আলাপ করে বিদায় নিয়ে বের হল অঞ্জন। এখলাস সাহেবের গাড়ি নিল না। দেখা যাক লোকটা এখানেও পিছু নেয় কি-না।

কিছুদুর হেঁটে রাস্তায় এসে রিক্সা নিল অঞ্জন। এই এলাকাটা বেশ ফাঁকাফাঁকা। পুরো আবাসিক এলাকার পরিবেশ বজায় আছে এখনো। রাত হওয়ায় একেবারে নির্জন হয়ে গেছে চারিদিক। রিক্সায় বসে থেকেই কিছুক্ষন পর পিছনে একটা রিক্সার অস্তিত্ব টের পেল সে। বেশ কিছুটা দুরে হলেও ওর মনেহল তাকে অনুসরন করছে।

রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা দোকান দেখে রিক্সা থামাল সে। সিগারেট কিনে ধরাল। পিছনের রিক্সাটা ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। অঞ্জন দেখতে পেল সামনের মোড় ঘুরেই সেটা থেমেছে। অপেক্ষা করছে।

রিক্সাঅলাকে টাকা দিয়ে বিপরীতদিকে হাঁটা শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে আলো ঝলমলে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সামনের রিক্সা থেকে কেউ যদি তাকে অনুসরন করে তাহলে ওই লোক এত সহজে টের পাবে না তার অবস্থান। আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করবে সেখানে।

আরেকটা রিক্সা নিয়ে বাড়ি রওনা হল। বাড়ির সামনে রিক্সা থেকে নেমে অবাক হল অঞ্জন। পুরো বাড়ি অন্ধকার। আশেপাশের অন্য বাড়িতে আলো জ্বলছে, তারমানে ইলেকট্রিসিটি আছে। কি হয়েছে এই বাড়িতে? ইলেকট্রিক লাইনে সমস্যা? তাহলেও মোমবাতি কিংবা অন্য আলো থাকার কথা। কোন জানালায় এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে না।

বারান্দায় উঠে নিজের ঘরের দিকে গেল সে। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে দরজা খোলা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ম্যাচ বের করল। জ্বালল। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল। আলো জ্বলে উঠল বারান্দায়। লাইন ঠিক আছে। কেউ অফ করে রেখেছে।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল অঞ্জন। ওর ঘর লন্ডভন্ড। বিছানা টেনে মেঝেতে ফেলা হয়েছে, সেলফের বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে। টেবিলের ড্রয়ার খোলা। সব জিনিসপত্র মেঝেতে।

ঘুরেই দৌড় দিল অঞ্জন। ওদিকের অবস্থা কি?

নীলাদের সবগুলি ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে একটা একটা করে লাইট জ্বালল অঞ্জন। কেউ নেই। নীলা, নীলার মা কেউ নেই। দৌড়ে সবগুলো ঘর দেখল অঞ্জন, কেউ নেই কোথাও।

হতবাক হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল অঞ্জন। কিছু একটা ঘটেছে। মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে।

হঠাৎ করেই নিজেকে অপরাধী মনে হল অঞ্জনের। এসবকিছুর জন্য স্তেই দায়ী। সুন্দর সুখী একটা পরিবারে বিপদ ডেকে এনেছে সে। তার পরিচয়ে যে যেখানে যাচ্ছে সেখানেই বিপদে পড়ছে লোকজন। আর সে নিজে নিরাপদে চলাফেরা করছে। সবাই যে যেভাবে পারে সাহায্য করছে তাকে, সে কারো জন্য কিছুই করছে না। করতে পারছে না।

হতাস হয়ে একটা চেয়ারে বসল অঞ্জন। তখনই একটা শব্দ শুনল কোথায় যেন। কান খাড়া করল ও। আবার শোনা গেল শব্দটা। বাথরুম থেকে শব্দ আসছে। বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলল অঞ্জন। লাইট জ্বালল। দেখল কাজের মেয়েটা বসে রয়েছে বাথরুমের মেঝেতে। মুখ-হাত বাঁধা। খুলে দিতেই হাউমাউ করে কান্না শুরু করল। ধমক দিয়ে থামাতে হল অঞ্জনকে, 'এ্যাই, চুপ।'

দ্বিতীয়বার ধমক দেয়ায় কাজ হল। কান্না থামাল। ভয়ে চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে অঞ্জনের দিকে।

ওকে হাত ধরে বাইরে আনল অঞ্জন। বলল, 'খবরদার কাঁদবি না, নিলুরা কোথায়?'

আবার কাঁদার প্রস'তি নিচ্ছে সে। আবার ধমক দিল অঞ্জন, 'কাঁদলে চড় খাবি। নিলুরা কোথায়?'

'হাসপাতালে।' এবার মুখ খুলল তার।

'কেন? হাসপাতালে কেন?' গলা নরম করল অঞ্জন, 'কাঁদিস না, আমি আছি কোন ভয় নেই। ভালভাবে বল কি হয়েছে-'

'খালুজান হাসপাতালে ভর্তি হইছে-'

রীতিমত কষ্ট করে তার কাছ থেকে কথা উদ্ধার করতে হল অঞ্জনের। যা জানতে পেল তা হচ্ছে সন্ধ্যায় কেউ ফোন করে খবর দিয়েছে নীলার বাবা হাসপাতালে আহত অবস্থায় ভর্তি হয়েছে। খবর পেয়ে নীলার মা নীলাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। সে একাই ছিল ঘরে। টিভি দেখছিল। তখন একজন লোক বাড়িতে ঢুকে তাকে বেঁধে বাথরুমে বন্ধ করে রাখে। এরপর কি হয়েছে সে জানে না।

কোনমতে তার কাছ থেকে হাসপাতালের নাম জেনে তাকে আবার টিভি দেখতে বলে বাইরে বের হল অঞ্জন। বলে দিল নীলা এবং তার মা ছাড়া অন্য কেউ এলে যেন দরজা না খোলে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দরজা বন্ধ করাল তাকে দিয়ে।

দ্রুত রাস্তায় বের হয়ে ট্যাক্সি খুঁজল। অতিরিক্ত দশটাকা দিয়ে রাজী করিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যখন হাসপাতালে পৌছাল, দেখল নীলা আর তার মা বসে আছেন একটা ঘরে। নীলার বাবা যেখানে রয়েছেন সেখানে যেতে দেয়নি ওদের। তার কি অবস্থা তাও জানে না তারা। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেঁদেছে দুজনই। অঞ্জনকে দেখে ব্যাকুলভাবে উঠে দাঁড়াল দুজন। কোন কথা ফুটল না কারো মুখে। কোনমনে তাদের বুঝিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে খোঁজ নিতে গেল অঞ্জন। ভেতরে গিয়ে আলাপ করল ডাক্তারের সাথে।

সন্ধ্যার দিকে রাস্তায় নীলার বাবাকে কেউ ছুরি নিয়ে আক্রমন করে। আশেপাশের লোকজন দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে হামলাকারী পালিয়ে যায়। পথচারীরাই তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। আঘাত লেগেছে ঘাড়ে আর পিঠে। আঘাত খুব মারাত্মক না, বেঁচে যাবেন।

ডাক্তারদের সাধ্যমত করার অনুরোধ করল অঞ্জন। অনেক সময় এরা টাকার কথা ভাবে, শুনেছে সে। সে নিশ্চয়তা দিল যা খরচ হয় দেয়া হবে। এখলাস সাহেবের রেফারেন্স দিল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি যেন না হয়।

নীলাদের কাছে ফিরল অঞ্জন। দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। একজন মহিলা আর একজন অল্পবয়সী মেয়ে কোনমতেই সামলাতে পারবে না এসব। নীলার মাকে বুঝানো দরকার। বুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো দরকার।

নীলার মাকে সে বুঝাতে শুরু করল, 'আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি, ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই। একটু সময় লাগবে সেরে উঠতে। আপনি নিলুকে নিয়ে বাসায় চলে যান। আমি এখানে থাকছি। কোন দরকার হলে আমি দেখতে পারব।'

নীলার মা রাজী হচ্ছেন না। এছাড়া অন্য কোন পথও দেখছে না অঞ্জন। যেভাবে হোক ওদের দুজনকে বাড়ি পাঠাতে হবে। বাড়ির খবরও খুব ভাল না।

সে বলল, 'আপনি আপত্তি করবেন না। এখানে কোন সমস্যা হবে না। আমি ফোনে যোগাযোগ রাখব বাড়ির সাথে। বাড়িটাও দেখা দরকার। বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। কি নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। আমি গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি, আপনারা বাড়ি চলে যান। আমি পুলিশের ব্যবস্থাও করছি, ওরা গেটে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেবে। আপনারা কোনভাবেই বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও যাবেন না।'

ওদের সাথে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল অঞ্জন। নীলাকে শান্তনা দিয়ে বলল, 'নিলু, ভয় পেয় না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি তোমার মাকে দেখে রাখ। কোন সমস্যা হলে এখানে ফোন করবে।'

ওদের বিদায় করে এখলাস সাহেবকে ফোন করল অঞ্জন। পরিস্থিতি জানাল। বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নেই, তাদের নিরাপত্তা দরকার শুনে তখনই লোক পাঠানোর নিশ্চয়তা দিলেন তিনি। কিছুক্ষন অপেক্ষা করে বাড়িতে ফোন করে নীলাদের পৌছার খবর নিল অঞ্জন। নিশ্চিত হল সেখানে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুনে।

সকালে নীলার বাবাকে দেখার সুযোগ পেল অঞ্জন। তাকে বলে দেয়া হয়েছে কথা বলা যাবে না। তাহলেও দেখল অঞ্জন। এই প্রথমবারের মত। রোগাপাতলা চেহারা। মাথাভর্তি ঘন চুল। নীলা একেবারে বাবার চেহারা পেয়েছে। চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন তিনি বিছানায়। সম্ভবত ওষুধের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেননি।

অঞ্জনের মনে পড়ল কোন কারনে তাকে এড়িয়ে চলেছেন তিনি এতদিন। একবারও তার সামনে পরেননি। কেন সেটা করেছেন জানে না সে।

ফোন করে নীলার ম'ার সাথে কথা বলল অঞ্জন। নীলার বাবা স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে আছেন, আর ভয়ের কিছু নেই। দুপুরে তারসাথে কথা বলা যাবে। তারা আসতে চাওয়ায় অঞ্জনকে বাড়ি ফিরতে হল। গোছল করে খেয়ে নিল সে। সারারাত চেয়ারে বসে কাটাতে হয়েছে তাকে, খাওয়া ঘুম হয়নি। বেশ কিছুটা সময় বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিল। এতকিছুর মধ্যেও ঘরটা গুছিয়ে এনেছে নীলা। জিজ্ঞেস করে জানল ওদের কিছু চুরি হয়েছে বলে জানা যায়নি। সামনের দামী জিনিষপত্র সবই রয়েছে। নীলাকে দেখে মায়া হল অঞ্জনের। একেবারে দমে গেছে। একটা কথাও বলছে না।

দুপুরে হঠাৎ করেই আকাশে মেঘ করল। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। ওরা ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালের গেট দিয়ে ঢোকার সাথেসাথেই বৃষ্টি শুরু হল।

নীলার বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন। সেখানে এসে ঢুকল ওরা। নীলার মা কাছে গিয়ে কথা বললেন তারসাথে। কথা বলল নীলাও। অপেক্ষা করল অঞ্জন। তাকেও কথা বলতে হবে। নীলার বাবাই এখন তারকাছে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন সুত্র। তিনি জানাতে পারেন অনেক কিছুই। তাকে হুমকি দেয়ার কথা নিজে শুনেছে অঞ্জন। এখন তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। কেন সেটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন।

নীলা এবং তার মায়ের বাইরে যাওয়ার অপেক্ষা করল অঞ্জন। তারপর এগিয়ে গেল নীলার বাবার কাছে। তিনি হয়ত এখনও অঞ্জনকে চেনেন না, একবার ভাবল অঞ্জন। কথা শুরু করল সেভাবেই।

বলল, 'আমার নাম অঞ্জন। আপনার সাথে আগে কথা হয়নি।'

তিনি হাঁসলেন কষ্ট করে। অঞ্জন সময় দিল তাকে। তারপর সরাসরি কথায় গেল, 'ওরা আপনার কাছে কিছু একটা খোঁজ করেছে। আমার জানা দরকার সেটা কি? ওরা আপনাকে আক্রমন করেছে, বাড়িতে ঢুকে জিনিষপত্র তছনছ করেছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আবারো আক্রমন করবে। অন্যদের ক্ষতি করবে।'

অপেক্ষা করছে অঞ্জন। তিনি নিশ্চয়ই বলবেন কিছু। উত্তর না পেয়ে আবার প্রশ্ন করল সে, 'ওরা ঠিক কি চায় বলবেন কি?'

কথাবলার প্রস'তি নিলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে কথা বলার মত শারীরিক সুন'তায় আসেননি এখনো। থেমে থেকে আস্তে আস্তে কথা বললেন, 'আমি ঠিক জানি না জিনিষটা কি। একটা ডায়রী বা নোটবুক জাতীয় কিছু। বলেছে আপনার কাছে আছে। আমি আপনাকে কোন ঝামেলায় ফেলতে চাইনি। বলেছি আপনার কাছে নেই।'

অঞ্জন লক্ষ্য করল তিনি আপনি করে বলছেন তাকে। কিন' সেটা ভেবে নষ্ট করার মত সময় নেই তার। দ্রুত একবার বিষয়টা ঝালাই করল অঞ্জন। ডায়রী অথবা নোটবই। কি হতে পারে? কার? তারকাছে আসবে কেন? কিভাবে?

সে বলল, 'ওদেরকে বলতেন সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে। তাহলে বোধহয় একটা সহজ সমাধান বের করা যেত।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর যা বললেন তাতে অঞ্জন বুঝে গেল তাকে কেন এড়িয়ে চলা হয়েছে। তিনি বললেন, 'ওরা খারাপ লোক। আমি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথানিচু করিনি।'

মনটা খারাপ হয়ে গেল অঞ্জনের। তারই জন্য এতকিছু। নীলার কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছেন, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, তবুও তাকে বলেননি কিছু। অদ্ভুত যুক্তি। এটা করলে অন্যায় মেনে নেয়া হয়।

নাকি অন্য কিছু চেষ্টা করেছেন? করে ব্যর্থ হয়েছেন? পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন হয়তো, চেয়ে পাননি।

আর ভাবতে পারল না অঞ্জন। তার কাছে ডায়রী বা নোটবুক খোঁজ করছে ওরা। সেটা কার?

ওই চার সন্ত্রাসীদের কারো। ওদের কারো কাছে ছিল। বড়বাজারে ওই ঘটনার সময় হারিয়েছে। ওরা ধরে নিয়েছে ওটা অঞ্জনের কাছে।

না, নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়নি। বড়বাজারের সেই লোককেও সন্দেহ করেছে। সেজন্যই খুন হতে হয়েছে তাকে। তার কাছে পায়নি। পুলিশের হাতেও যায়নি। গেলে জানতে পেত। না পেয়ে এখন নিশ্চিত হয়েছে সেটা তারই কাছে। তার ঘরে সেটাই খুঁজেছে। সেজন্যই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরাসরি আক্রমন করেনি তাকে। নীলার বাবাকে ভয় দেখিয়ে সেটা আদায় করতে চেয়েছে।

কি আছে ওতে? ডায়রী কিংবা নোটবুক, যাই হোক- হাতে লেখা। তারমানে মানুষের নাম-ঠিকানা-টেলিফোন নাম্বার এইসব। হয়ত আরো বেশী কিছু। এমন কিছু যা ভুল লোকের হাতে পরলে ক্ষতি হবে কারো। এমন কারো যে খুব সহজে খুন করতে পারে।

জিনিষটা পায়নি ওরা। অঞ্জনের কাছে নেই। সে জানেও না ওটার কথা। ওরা জানে না সেকথা। এখনো খোঁজ করছে। নীলার বাবাকে দিয়ে কাজ হয়নি। তার ঘরে পায়নি। এরপর?

সাথেসাথে রেবেকার কথা মনেহল অঞ্জনের।

ওরা হয়ত জানে রেবেকার কথা। হাসপাতালে তার কাছে সবচেয়ে বেশিসময় ছিল রেবেকা। ছাড়া পাওয়ার পর রেবেকার সাথে কয়েকবার দেখা করেছে সে। হয়ত রেবেকার ঠিকানাও জেনে গেছে। ওরা যদি ধরে নেয় রেবেকার কাছে দিয়েছে সে তাহলে?

বিপদে পরবে রেবেকা।

দেরী করার মত সময় নেই। রেবেকাকে জানাতে হবে। সাবধানে থাকতে হবে রেবেকাকেও।

হাসপাতালে রেবেকাকে পেল না অঞ্জন। ওর ডিউটি নেই। হোষ্টেলে যাওয়ার জন্য স্কুটার ঠিক করল সে। যখন হোষ্টেলের সামনে নামল তখন বৃষ্টি হচ্ছে রীতিমত। বড় বড়

বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। দেখল হোস্টেলের গেটটা খোলা। কেউ নেই গেটে। মনেহয় বৃষ্টি দেখে দারোয়ান গেট খোলা রেখে অন্য কোথাও গেছে। আশেপাশে এমন কেউ নেই যাকে বলে রেবেকাকে ডাকার ব্যবস্থা করা যায়।

এগিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়াল অঞ্জন। কেউ ঢুকলে তাকে দিয়ে খবর দিতে হবে রেবেকাকে। কারো দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে। মাথা ভিজে গেছে। চুল থেকে টপটপ করে পানি ঝরে পড়ছে গালের ওপর। হাত দিয়ে পানি চিপে ঝেড়ে ফেলল অঞ্জন।

না। অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে একজনকেও পাওয়া গেল না। একসময় তাকে ফেরত যাওয়ার কথাই ভাবতে হল। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। কারও আসার লক্ষন নেই। একজনও ঢোকেনি, একজনও বের হয়নি। রাস্তার লোকজন সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করেছে। বৃষ্টি থামলে আসতে হবে। ঘুরে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল অঞ্জন।

'এই-যে।'

চমকে ঘুরে দাঁড়াল অঞ্জন। রেবেকা। এসে গেটে দাঁড়িয়েছে। হাতে ছোট একটা রঙচঙে ছাতা। বের হয়ে দ্রুত এগিয়ে এল অঞ্জনের দিকে।

'এভাবে বৃষ্টিতে ভিজছেন, আবার নতুন অসুখ বাধাবেন।'

কথা বলার সুযোগ পেল না অঞ্জন। রেবেকার মুখে বৃষ্টির পানির ছিটে লেগেছে। বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে চুলে, গালের ওপর। ভেজা শাপলা ফুল মনে হচ্ছে ওকে।

'এটা নিন। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান।'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে ছাতাটা অঞ্জনের হাতে ধরিয়ে দিল রেবেকা। তারপরই ঘুরে দৌড় দিল।

'রেবেকা, একটা কথা আছে-' বলতে চেষ্টা করল অঞ্জন।

গেটের কাছে থামল রেবেকা। মাথার ওপর হাত দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

'পরে শুনব, বৃষ্টিতে ভিজবেন না।' দাঁড়িয়ে বলেই দৌড় দিল। ঢুকে গেল গেটের ভেতর।

মাথায় ছাতা ধরে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল অঞ্জন। রেবেকা বুঝতে পারেনি কতটা জরুরী কথা বলা। ভেবেছে অঞ্জন শুধুশুধু দেখা করতে এসেছে ওর সাথে।

বৃষ্টি আরো বেড়েছে। বড়বড় ফোটা পরছে এখন। ছাতার ওপর পানি পরার টুপটাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টির ঝাপটা আসছে ওর পেছন দিক থেকে। বুঝতে পারছে ওর শরীরের নিচের অংশ ভিজে যাচ্ছে পানিতে।

আরো দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হল অঞ্জনের। নিশ্চয়ই রেবেকা ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে তাকাবে। দেখবে ও এখনও দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিতে। হয়ত আবার আসবে।

দাঁড়িয়েই থাকল অঞ্জন। হোস্টেলের জানালাগুলোর দিকে চোখ গেল ওর। কয়েকজন বসে রয়েছে জানালার ধারে। সোজা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। নিশ্চয়ই একটু আগে রেবেকাকে ওরসাথে কথা বলতে দেখেছে। কোন জানালায় রেবেকার দেখা পেল না সে। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই জানালার কাছে আসেনি।

হতাস হয়ে মুখ ঘুরাল অঞ্জন। রাস্তার উল্টোদিকে চোখ গেল ওর। আর সাথেসাথে চমকে উঠল। সেই লোক। তাকে ফলো করছে। দাঁড়িয়ে আছে একটা দোকানের বারান্দায়।

সাথেসাথে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও।

আর না। যথেষ্ট হয়েছে। অনেক সহ্য করেছে সে। এখন সে জানে শত্রুর উদ্দেশ্য। পাল্টা ছোবল মারতে হবে তাকেও। ছেড়ে দেবে না সে এই লোককে। এর পেছনে যে-ই থাকুক, তাকেও। এই লোককে দিয়েই তারকাছে পৌছাবে সে। সেজন্য যা করতে হয় করবে, যতবড় অন্যায় করতে হয় করবে। এটা করা ছাড়া তার জীবনে আর কোন কাজ নেই।

হাঁটতে হাঁটতে অঞ্জন আড়চোখে তাকিয়ে দেখল লোকটাও হাঁটছে রাস্তার ওপাশ দিয়ে। দোকানের পাশ দিয়ে, যতটা সম্ভব বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে। অঞ্জনের হাতে ছাতা, ওই লোকের নেই।

হাঁটতে হাঁটতেই কিভাবে কি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অঞ্জন। ওই লোকটাকে বিভ্রান্ত করতে হবে। ওর চোখে ধুলো দিয়ে সরে পরতে হবে আগে, তারপর দেখতে হবে সে কি করে, কোথায় যায়। এতদিন তাকে অনুসরন করেছে ওই লোক, এবার সে অনুসরন করবে তাকে। তারসাথে গিয়ে দেখবে কে কলকাঠি নাড়াচ্ছে। সে কুদ্দুস না মোটেই। কিভাবে ঘোল খাওয়াতে হয় দেখিয়ে দেবে সে।

আগে না দেখলেও আজ রেবেকার ঠিকানা দেখেছে। রেবেকাকে চিনেছে। যেকোন সময় তার ক্ষতি করবে ওরা।

কিছুদুর এগিয়ে বারান্দার সামনের ভিড় ঠেলে একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে গেল অঞ্জন। ভেতর থেকেই দেখতে পেল লোকটা রাস্তা পার হচ্ছে। এখনও বোঝেনি অঞ্জন তাকে লক্ষ্য করেছে। অথবা বুঝলেও সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

দরজার দিকে মুখ করে একটা টেবিলে বসল অঞ্জন। ভেজা ছাতাটা ভাঁজ করে রাখল টেবিলের সাথে। রেষ্টুরেন্টের মেঝেতে পানি গড়াচ্ছে, এনিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। বাইরে ডালপুরি ভাঁজতে দেখেছে সে। ডালপুরি আর চা দিতে বলল অঞ্জন। দেখল লোকটা কিছুক্ষন বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় ঢুকল। একটু দুরে আরেকটা টেবিলে বসল। লোকটার মুখে বিরক্তি। বোধহয় বৃষ্টিতে ভিজে এধরনের কাজ করতে পছন্দ করছে না। বোঝা যাচ্ছে তাকে শুধু নজর রাখতেই বলা হয়েছে। কোনমতেই যেন অঞ্জন তার দৃষ্টির বাইরে না যায়।

সময় নিয়ে খেতে থাকল অঞ্জন। এককাপ চা খাওয়ার পর বসে থাকল চুপ করে। কিছুক্ষন পর আরেককাপ দিতে বলল। রেষ্টুরেন্টের লোকজন বোধহয় এ অবস্থার সাথে পরিচিত। বেশিরভাগ লোকই এককাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বৃষ্টি কমার অপেক্ষা করে।

বৃষ্টি কিছুটা কমেছে কিন' হঠাৎ করেই আরো অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। আরো জোরে নামবে যে কোন সময়।

হাতের ইশারায় পানি এগিয়ে দেয়া ছোট ছেলেটাকে ডাকল অঞ্জন। জিজ্ঞেস করল রেষ্টুরেন্টের বাইরে লাগোয়া দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে কিনা। পাওয়া যাবে জানা কথা। বসে থেকেই লোকজনকে সিগারেট ধরাতে দেখা যাচ্ছে।

'ছাতাটা দেখ, সিগারেট ধরিয়ে আনি।' বলে উঠে গেল অঞ্জন।

দুটো কাজ আশা করল সে। টেবিলে ছাতা দেখে লোকটা ভাববে সে ফেরত আসবে। আর রেষ্টুরেন্টের লোককে জানানো সে বিল ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে না।

দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল অঞ্জন। ভেতরে তাকিয়ে দেখল ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। লোকটা বসেছে আরো বামদিকে, বাইরে থেকে দেখা যায় না।

হাতের ইশারায় ছেলেটাকে ডাকল সে। তারহাতে বিশ টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিল। দিয়ে বলল, 'বিল দিয়ে বাকিটা রেখে দিবি। বাড়ি যাওয়ার সময় ছাতাটা নিয়ে যাবি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। টাকার সাথে ছাতাটাও বখশিশ। একটু সময় নিল বুঝতে। বুঝে হাসল। দাঁত বের করে হাঁসতে হাঁসতে এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে।

সময় নষ্ট করল না অঞ্জন। রাস্তায় নেমে পরল। বড় একটা বৃষ্টির ফোঁটা পরল সিগারেটের আগুনের ওপর। একেবারে নিভে গেল সেটা। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রাস্তা পার হল সে। অপরদিকের ভীড়ের মধ্যে ঢুকল।

এখন সে নজর রাখবে লোকটার ওপর।

বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না। সম্ভবত ছেলেটা ছাতা সরানোয় কিছুএকটা টের পেয়েছে লোকটা। একটু পরই বাইরে এসে দাঁড়াল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল অঞ্জনকে। ভাল করে অন্য লোকজনের আড়ালে গা ঢেকে দাঁড়িয়েছে অঞ্জন। দুর থেকে শুধুমাত্র মুখ দেখে চিনতে পারবে না।

লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দুদিকেই দেখল। তারপর অঞ্জন ডানদিকে গেছে ধরে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই পথে নামল। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। বেশ ব্যস্ততার সাথে হাঁটছে। তবে বেশিদুর গেল না। অল্প কিছুদুর গিয়েই থামল। থেমে উল্টোদিকে চেয়ে দেখল। ঠিক করতে পারছে না কোনদিকে যাবে। উল্টোদিকে কয়েক পা এসে থামল, তারপর থেমে ঘুরে আবার আগের দিকেই হাঁটতে লাগল।

চোখ সরাচ্ছেনা অঞ্জন। তাকেই খুঁজছে ওই লোক। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে ব্যস্তভাবে হাঁটছে। একসময় বোধহয় হাল ছেড়ে দিল লোকটা। একটা বারান্দার কাছে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়াল। এরপর কি করবে ভাবছে।

বেশ কিছুক্ষন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে। চারিদিকে দোকান দেখছে। যেখানে দাঁড়িয়েছে তার কাছেই একটা টেলিফোনের দোকান। সেদিকে পা বাড়াল। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকল সেখানে। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখতে পেল অঞ্জন, পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল। মনেহয় তাতে ফোন নাম্বার লেখা। দোকানের লোক নিজেই ডায়াল করতে চেয়েছিল, সে ফোনটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে নিজেই ডায়াল করল। হ্যান্ডসেটটা কাঁধ আর কানের মধ্যে ধরে আছে। বামহাতে কাগজটা তুলে ধরা।

মনেহয় ওপাশে কেউ ফোন ধরছে না। কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর কাগজটা আবার ভালভাবে দেখল লোকটা। আবার নতুনভাবে নাম্বার টিপে ডায়াল করল। কাজ হল না এবারও। আরেকবার বিফল চেষ্টা করল।

কাগজটা পকেটে রাখল এবার। বের হয়ে আসছে। দোকানদার থামাল তাকে। টাকা চাইছে। লোকটা তর্ক করছে তারসাথে। টেলিফোনে কথা হয়নি বলে সম্ভবত টাকা

দিতে অস্বীকার করছে লোকটা। শেষপর্যন্ত তারই জিত হল। টাকা না দিয়েই বের হল দোকান থেকে। দোকানদার রাগতভাবে তার যাওয়া দেখল। দুর থেকে তার কথা না শুনে শুধু মুখভঙ্গি দেখেই বুঝল অঞ্জন, বের হওয়ার পর দোকানদার গালি দিচ্ছে লোকটাকে।

সে বাইরে এসে আরেকবার অঞ্জনের খোঁজে তাকাল চারিদিকে।

এবারে এর মুখভঙ্গি দেখল অঞ্জন। বিরক্তি, রাগ, হতাসা। এখন একটা কাজই করার আছে তার, নিজে উপস্থিত হয়ে রিপোর্ট করা।

রেষ্টুরেন্টের কাছে বেশ কয়েকটি সিএনজিচালিত বেবিট্যাক্সি। লোকটা এগিয়ে গিয়ে দরদাম করতে শুরু করল। রাজী হচ্ছে না কেউ। মনেহল যেতে চাইছে না সে যেখানে যেতে চায়। একজন হয়ত বেশী টাকায় রাজী হল। সে উঠে বসায় ট্যাক্সি তাকে নিয়ে রওনা হল।

দ্রুত রাস্তায় নামল অঞ্জন। থেমে থাকা ট্যাক্সিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। নীল পোষাক পড়ে সিগারেট খাচ্ছে একজন ড্রাইভার। মোটা গোঁফ, কাল কুচকুচে গায়ের রঙ। এ যেতে চায়নি লোকটা যেখানে যাবে। একেই টার্গেট করল সে।

'এ্যাই, আমি র‍্যাবের লোক। গাড়িতে ওঠ।'

লোকটা ঘুরে তাকিয়ে একবার দেখল অঞ্জনকে। গাইগুই করছে। কিছু একটা অজুহাত তৈরী করবে এখনই। সেজন্য সময় দিল না অঞ্জন। ধমকের জোর বাড়ালো, 'ওঠ তাড়াতাড়ি, ষ্টার্ট দে।'

মনেমনে প্রমাদ গুনল ড্রাইভার। স্বাস্থ্য দেখে র‍্যাবের লোক বলেই মনে হয়। এরপর আবার কি বিপদে ফেলবে কে জানে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মুখে বিরক্তি নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। দ্রুত উঠে বসল অঞ্জন।

সামনের গাড়িটা এখনও দেখা যাচ্ছে দুরে। গাড়ি ছাড়তেই বলল, 'ওই গাড়িটার পেছনে যাবে। একটু এদিক ওদিক করলে সোজা থানায় নিয়ে যাব।'

ড্রাইভার দ্বিরুক্তি করল না। গাড়ি চলতে শুরু করল। আবার মনে করিয়ে দিল অঞ্জন, 'সামনের গাড়িটা হারাবে না। যেখানে যায় সেখানে যাবে।'

'হ্যায় গুলশান যাইব।' বিরক্তভাবে বলল ড্রাইভার।

'তুমিও যাও।'

বলে একটু নিশ্চিত বোধ করল অঞ্জন। ড্রাইভার বুঝতে পেরেছে কি করতে হবে। তাকে গুলশান যাওয়ার কথা বলেছিল। গন্তব্য যখন জানা তখন হারানোর সম্ভাবনা কম।

তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ততক্ষনে। সাদা ধোঁয়ার মত বৃষ্টির পানি সামনের রাস্তা ঝাপসা করে দিয়েছে। এরই মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে অঞ্জনের গাড়ি। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে খুব অল্প সময়েই ফার্মগেট, মহাখালি হয়ে আতাতুর্ক এভিনিউ ধরল গাড়ি। বনানী দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গুলশান দুই নম্বর থেকে এক নম্বরের দিকে। একটু পরই ওয়ান্ডারল্যান্ডে পৌছার আগেই বামদিকে বাঁক নিল সামনের গাড়ি। গতি কমাতে বলল অঞ্জন। আবারো মনে করিয়ে দিল সামনের গাড়ি যেন টের না পায় কেউ অনুসরন করছে তাকে।

ছোট রাস্তায় ঢুকে সোজা তাকাতেই দেখল বেশ কিছুটা দুরে একটা বাড়ির সামনে থেমেছে আগের গাড়ি। সাথেসাথে ড্রাইভারকে থামতে বলল অঞ্জন। থামিয়ে সেখানেই বসে থাকল গাড়িতে।

সামনের গাড়ি থেকে লোকটা নামল। তাকে নামিয়েই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘুরে চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে। লোকটা কলিংবেল বাজাচ্ছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর গেট খুলল। ঢুকে গেল লোকটা।

নেমে পরল অঞ্জন। ড্রাইভার এতক্ষন চেয়েছিল সামনের গাড়ির দিকে, এবার ঘুরে অবাক হয়ে তাকাল তারদিকে। টাকা না দিলে টাকাও চাইবে না হয়ত। সে একটা একশ টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'এখানে ঘোরাফেরা করবে না। গোলাগুলি হবে, তাড়াতাড়ি দুরে চলে যাও।'

বুঝতে সময় লাগল না ড্রাইভারের। ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটল। নিজের পরিচিত কোন আড্ডায় না পৌছে থামবে না সে। তাদের জানিয়ে দেবে কোথায় র‍্যাবের অভিযান চলছে। আগামীকালের কাগজ কিনে দেখবে তার কথা ছাপা হয়েছে কিনা।

সামনে এগিয়ে গেল অঞ্জন। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক। দুএকটা বাড়ি থেকে যে সামান্য আলো এসে পরেছে তাতে কেউ দেখতে পাবে না তাকে। এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কেউ জানালায়ও দাঁড়াবে না। একটা বাড়ির খিলানের নিচে অন্ধকারে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়াল সে। অপেক্ষা করতে থাকল।

দশ কি পনের মিনিট পর গেট খোলার শব্দ শুনল সে। লোকটা বের হচ্ছে। তার পিছনে গেট বন্ধ হয়ে গেল শব্দ করে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে নজর রাখল সে লোকটার ওপর। রাস্তায় এসে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না তা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই তার। কোনকিছুতেই যেন তার কিছু যায় আসে না। থপথপ করে পা ফেলছে। একেবারে হতাস ভঙ্গিতে হাঁটা। বোঝা যাচ্ছে কাজ ঠিকমত না করায় ঝড় বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে।

অঞ্জনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর বের হল সে। এগিয়ে এসে লোকটার পিছু নিল। একেবারে পিছনে এসে হাঁটতে লাগল। টের পেল না লোকটা। চারিদিকে প্রবল বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে। অঞ্জন হাঁটতেই থাকল ওর কয়েক হাত পিছনে। ইচ্ছে করলে ওকে ছুয়ে দিতে পারে এতটাই কম দুরত্বে। তারপর ফাঁকা সুবিধামত একটা যায়গা দেখে অঞ্জন থামাল ওকে। কাঁধের ওপর হাত রাখল।

লোকটা দাঁড়াল। ঘুরল। অঞ্জনকে চিনতে পেরে চোখ কপালে উঠল ওর। হা করল। চিৎকার করার প্রস'তি। সাথেসাথে কানের পাশে ঘুসি মারল অঞ্জন যতটা জোরে মারা সম্ভব। মুখ খোলার কোনরকম সুযোগই পেল না লোকটা। ধপ করে পরে গেল রাস্তায়।

জামার কলার ধরে ওকে টেনে পাশেই একটা বাড়ির দেয়ালের পাশে এনে ফেলল অঞ্জন। একটুকু নড়ছে না। জ্ঞান হারিয়েছে। ওর পকেট হাতড়াল অঞ্জন। পকেট থেকে কাগজ দেখে ফোন করেছিল। পকেটে যাকিছু পাওয়া গেল সব বের করে নিল। মানিব্যাগ, ছোট একটা টেলিফোন ডিরেক্টরী, কিছু টাকা, কয়েকটা নেমকার্ড। একটা কাগজে মোড়ানো পান দেখে ফেলে দিল সেটা। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ওকে ওভাবে ফেলে রেখেই ফিরে আসতে যাচ্ছিল সে, তখনই কুদ্দুসের কথা মনে পরল। কুদ্দুসের পরিনতির জন্য এই লোক দায়ী। হয়ত নীলার বাবাকে ছুরি মারা জন্যও। একে এত সহজে ছেড়ে দেয়া যায় না।

কলার ধরে উচু করে মাথাটা ঠুকে দিল দেয়ালে। তারপর টেনে এনে ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিল। বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে ড্রেন দিয়ে। মাথাটা উচু হয়ে থাকল ড্রেনের পাশে। ভাগ্য ভাল থাকলে এরপরও বাঁচবে। বেঁচে উঠলে আর যাই করুক অন্তত ওই বাড়িতে যাবে না আবার। আরেক দফা গালাগালি হজম করবে না। সুযোগ পেলেই পালাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মেনরোডে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। রাস্তায় কোন গাড়ি নেই। গাড়ি পাওয়ার চেষ্টা করলে অন্তত মোড় পর্যন্ত যেতে হবে। সেদিকেই হাঁটতে শুরু করল সে। মোড়ে পৌছে একটা টেলিফোনের দোকানের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

জামাকাপড় সম্পুর্ন ভিজে গেছে। রীতিমত হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে। হাত দিয়ে চুলের পানি সরাল সে। ওই লোকের পকেট থেকে পাওয়া জিনিষগুলি বের করল। বেশ কয়েকটা নেমকার্ড, একটা সাদা কাগজ। এই কাগজেই নাম্বার লেখা। নাম্বারটা ভাল করে দেখে কাগজগুলি পকেটে রাখল সে। মানিব্যাগ আর অন্য জিনিষগুলি ফেলে দিল একপাশে। এসে দোকানে ঢুকল। অল্পবয়সী একটা ছেলে বসে আছে চুপ করে। অঞ্জন ঢুকতেই মুখটা হাসিহাসি করে ঘুরে তাকাল।

‘একটা ফোন করব।’ বলল অঞ্জন।

‘নাম্বার?’ জানতে চাইল সেখানে বসা ছেলেটা।

‘দিন, আমি ডায়াল করছি।’

ফোনটা নিয়ে নাম্বার টিপল অঞ্জন। ওই লোকটা লাইন পায়নি, কিন' অঞ্জনের পেতে দেরী হল না। সাথেসাথেই ওপাশ থেকে একজন ফোন উঠাল।

‘হ্যাঁলো।’

চমকে উঠল অঞ্জন। সেই ফ্যাঁসফেসে গলা।

হ্যান্ডসেট কানে লাগিয়ে চুপ করে থাকল সে। কোন কথা বলল না। ওদিকে কিসের যেন খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাঁতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে কেউ।

‘হ্যাঁলো, কেডা?’ আবার প্রশ্ন করল ফ্যাঁসফেসে গলা।

চুপ করে আছে অঞ্জন। দেখল দোকানের ছেলেটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তারদিকে। অঞ্জন তাকানোয় চোখ সরিয়ে নিল।

‘গলায় কি ব্যাঙ ঢুকছে, বান্দর কোনহানকার-’

ওপাশ থেকে গালাগালির শব্দ শোনা গেল। হ্যান্ডসেটটা নামিয়ে রেখে দিল অঞ্জন। ছেলেটাকে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বাইরে বের হল।

তার কাজ হয়েছে। ফ্যাঁসফেসে গলার লোকটাকে খুঁজছিল সে, খুঁজছিল তার ঠিকানা। বাড়ি চিনে গেছে সে। ওই বাড়িতেই আছে ফ্যাঁসফেসে গলার ওই লোক। তাকে ঢুকতে হবে ওখানে।

ট্যাক্সির খোঁজে রাস্তায় বের হল সে।

আগারগাঁ পৌছে ট্যাক্সি থেকে নেমে অঞ্জন যখন বস্তির দিকে এগোল তখন বৃষ্টি একেবারে কমে গেছে। গুড়িগুড়ি পরছে। দোকানে বাবুলের নাম বললেই চিনতে পারবে, বলেছিল বাবুল। দেখল মিটমিটে বাতি জ্বলছে একটা ছোট চা-সিগারেটের দোকানে। সামনের বেঞ্চে কয়েকজন লোক বসেছিল গুটিমেরে। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে একজন দুজন করে আস্তে সরে পরল। দোকানের ঠিক সামনে দাঁড়াল অঞ্জন। বেশ বয়সী দোকানদার। রোগা, হাড় বের করা। মুখে ইঞ্চিতিনেক লম্বা ছাগুলে দাড়ি, গোঁফ কামানো। খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে আছে। সতর্কভাবে চেয়ে আছে অঞ্জনের দিকে।

‘বাবুল কোথায়?’

‘কইতে পারি না।’

রীতিমত ভালমানুষী গলায় উত্তর দিল দোকানদার। মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি দিল।

সহজে এদের কাছ থেকে কথা বের করা যায় না। নানারকম অবৈধ ব্যবসা চলে এখানে। অপরিচিত মানুষ দেখলেই এরা মিথ্যে বলতে শুরু করে। ভয় দেখাতে হবে।

ধমক দিল অঞ্জন, ‘নাম, যা ডেকে আন। আমার নাম অঞ্জন। বল আমি ডেকেছি।’

দোকানদার ইতস্তত করছে। যাব কি যাব না ভাবছে। তাকে ভাবার সময় দিল না অঞ্জন। ধমকের জোর বাড়াল।

‘নাম ব্যাটা, যা দৌড় দে।’

আরেকবার অঞ্জনকে দেখল দোকানদার। তারপর কি বুঝল সে জানে, নেমে খালি পায়েই দৌড় দিল। একটু পরই দেখা গেল বাবুলকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে।

‘স্যার আপনে?’ বলেই থমকে দাঁড়াল। তারপরই পেছনে ঘুরে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়ানো দোকানদারকে ধমকে উঠল, ‘এ্যাই হারামজাদা, স্যাররে বিষ্টির মইদ্যে খাড়া করায়া রাখছস। চেনস এইডা কে?’

দোকানদার দুপক্ষের ধমক খেয়ে বুঝে উঠতে পারল না তার করনীয়। সে এগিয়ে এসে দোকানে মাথা গলিয়ে ভেতরে রাখা ছাতায় হাত দিল।

অঞ্জন বাবুলকে বলল, ‘শোন বাবুল, তোমার সাথে আলাপ আছে। জরুরী। এদিকে এস।’

বাবুলকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল অঞ্জন। লোকজনদের মধ্যে সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে। অঞ্জনের স্বাস্থ্যচেহারা বলে দিচ্ছে এধরনের মানুষ বিনা কারনে এখানে আসে না। এখানে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত। কেউ আগ বাড়িয়ে তাদের কথা শুনতে আসবে না। তাহলেও কোন ঝুঁকি নিতে চায় না অঞ্জন। বেশ কিছুটা এগিয়ে ফাঁকা যায়গায় দাঁড়াল সে। বাবুলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গলা নিচু করল সে, 'বাবুল, আমার একটা অস্ত্র লাগবে। এখনই। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

বাবুল অবাক হল শুনে। সোজা তাকাল অঞ্জনের মুখের দিকে। কোন কথা বের হল না তার মুখ দিয়ে।

অঞ্জন বলল, 'সময় নেই বাবুল, পাওয়া যাবে কি-না বল। লজ্জা করার কিছু নেই। তুমি নিজে কিছু করছ না। কত টাকা লাগবে জানাও আর তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর।'

আর সময় নষ্ট করল না বাবুল। সে জানে কোন সময় মানুষ অস্ত্রের খোঁজ করে, জানে সময়ের গুরুত্ব। সহজ স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলে সে, 'ধার নিবেন না কিনবেন? ধার নিয়া ফেরত দিলে ট্যাকা লাগব না।'

একমুহূর্ত সময় নিল অঞ্জন। ধার নেয়া মানে অল্প টাকায় কাজ শেষ করা। কাজ শেষ হলে অস্ত্রটা ফেরত দেয়া। কিনে নিলে ফেরত দেয়ার কথা ভাবতে হবে না, কিন' টাকার পরিমান বেড়ে যাবে অনেক।

ফেরত দেয়া কতটা সম্ভব?

দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিল সে। এর কাছে লুকানোর কোন প্রয়োজন নেই। ছেলেটা সরল মনের। বলল, 'এটা বিপদের কাজ, আমি নিজেই ফেরত আসব সে নিশ্চয়তা নেই। তুমি কেনার ব্যবস্থা কর। যত তাড়াতাড়ি পার। বেশি টাকা হলে এখনই দিতে পারব না। ঠিকানা দেব, পরে তোমাকে আনতে হবে।'

বাবুলের মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই। সে বুঝেছে বিষয়টা ভালমতই। সে জানে বিপদজনক সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়। তার সামনের এই লোকের হয়ত তার মত অভিজ্ঞতা নেই।

সে বলল, 'স্যার, ট্যাকা লাগব না। তয় একটা কতা কমু।'

'বল।'

'আমি আপনার লগে যামু।'

চমকে উঠল অঞ্জন। সে মোটেই এমনকিছু আশা করেনি।

একবার বাবুলের মুখ দেখল। চোখ নামিয়ে রেখেছে। কথার মধ্যে কোনরকম জড়তা নেই। সে ঠাট্টা করছে না। সত্যিই যেতে চায় তার সাথে।

একটু সময় লাগল তার উত্তর দিতে। জিজ্ঞেস করল, 'কি ধরনের কাজ বুঝতে পারছ?'

বাবুল একেবারে স্বাভাবিকভাবে শান্ত গলায় বলল, 'জ্বে স্যার। এইসব কামে একা সবদিক দেখা যায় না। আমি পিছনদিক দেখমু।'

দোটানায় পরল অঞ্জন। এ যেতে চাইছে কেন?

কিছু করতে না পেরে অনিশ্চয়তায় ভুগছে। যে কোন কাজেই নিজেকে জড়াতে চায়। হয়ত অঞ্জনকে বড় ধরনের কিছু মনে করেছে। সুলতানকে চিনতে ভূল করেনি সে। সুলতান তাকে স্যার বলে সম্বোধন করেছে। সে যা বলেছে তা-ই শুনেছে। তারমানে ধারনা করেছে সে সুলতানের চেয়ে বড় কিছু। এমন কেউ যার কথা সুলতানের মত মানুষ মান্য করে।

এর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সহজে পিছু ছাড়বেনা।

যদি সাথে থাকে-

সেটা বিরাট পাওয়া। সে একা কতটা সামলাতে পারবে ধারনা নেই। বিশাল একটা বাড়ির ঠিকানা সে পেয়েছে, সেই বাড়িতে একজন লোক আছে এটা জেনেছে। আর কিছুই জানে না সে। সেই লোক নিশ্চয়ই একা নেই বাড়িতে। তার সঙ্গিসাথীরা আছে, অস্ত্রসস্ত্র আছে। সে একা কি করতে পারবে সেখানে গিয়ে?

এর অভিজ্ঞতা আছে এসব কাজে। জানে কোথায় কিভাবে চলতে হয়, কোনদিকে নজর রাখতে হয়, কি করতে হয়।

কুদ্দুসের কথা, নীলার বাবার কথা মনে পড়ল তখনই। তারই জন্য বিপদে পরেছে তারা। কুদ্দুস হয়ত মারাই গেছে। নতুন করে আরেকজনকে বিপদের মধ্যে আনতে মন সায় দিচ্ছে না। সে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দেখ বাবুল, খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। তোমার ঘরে বউ আছে, কদিন পর ছেলের বাবা হবে। ওদের কথা ভেবে দেখ। আমার জন্য ভেবনা, আমি সাবধানে থাকব।'

বাবুল তার সিদ্ধানে- অনড়। বলল, 'পরিবারের কতা কইয়েন না স্যার। হ্যায় আমার চে শিক্ষিত। তারে কইয়া জীবনে অনেক খারাম কামে গ্যাছি। আইজ তারে কইয়া একটা ভাল কামে যামু। আপনে বিপদে না পরলে আমিও পরমু না।'

এরপর আর না করতে পারল না অঞ্জন। এটা তার মরনপন লড়াই। জিততেই হবে তাকে। একাএকা লড়াই করে হেরে ফিরে আসার কোন মানে হয় না। সে বলল, 'ঠিকআছে। চল কোথাও বসে আলাপ করে নেই।'

জামাকাপড় সম্পুর্ন ভিজে আছে অঞ্জনের। এঅবস্থায় ভাল হোটেলে ঢোকা যায় না। বাবুল ওকে কাছেই পরিচিত সস্তা হোটেলে নিয়ে গেল। এক কোনে বসে খাবার অর্ডার দিয়ে বাড়িটার বর্ননা দিল অঞ্জন।

'মন্ত্রীর বাড়ি।' সাথেসাথেই চিনল বাবুল।

'মন্ত্রীর বাড়ি?' অবাক হল অঞ্জন।

'পাতিমন্ত্রী।'

'পাতিমন্ত্রী মানে? প্রতিমন্ত্রী?'

'জ্বে স্যার, অস্ত্রের কারবার।'

অবাক হল অঞ্জন। প্রতিমন্ত্রী অস্ত্রের ব্যবসা করছে। বাবুল সেটা ভালভাবেই জানে। আরো অনেকেই নিশ্চয়ই জানে। তারপরও ব্যবসা চালাচ্ছে কিভাবে?

'মন্ত্রী হয়ে অস্ত্রের ব্যবসা করছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

‘না স্যার, অস্ত্রের কারবারী মন্ত্রী হইছে।’ সংশোধন করল বাবুল, ‘আগে ছিটকা মাস্তান আছিল। ক্যামনে এত ট্যাকার মালিক হইছে কেউ খোঁজ করে নাই। ট্যাকার জোরে মন্ত্রী হইছে।’

বাবুলের গলা একেবারে নির্লিপ্ত। অপরাধ জগতের খবর সে ভালমতই রাখে। কে কি করছে, কে আগে কি ছিল সবই তার জানা।

নতুন করে ভাবতে হল অঞ্জনকে। জিজ্ঞেস করল, ‘ওই বাড়ি সম্পর্কে আর কি জান? কে থাকে ওখানে?’

বাবুল জানাল, ‘হ্যার ডান হাত। একবার গুলি লাগছিল গলায়। ঠিকমত কতা কইতে পারে না।’

‘ফ্যাঁসফেসে গলায় কথা বলে?’ জানতে চাইল অঞ্জন।

‘জ্বে।’

তার ধারনায় কোন ভুল নেই। টেলিফোনটা ওই বাড়িতেই। এটাই সেই লোক। দলের হোতার ডানহাত।

সে বলল, ‘শোন বাবুল, এই লোককেও ছাড়ব না। আমার পরিচিত একজনকে ছুরি মেরেছে, একজনকে গাড়িচাপা দিয়েছে। ও নিজে নয়ত ওর লোক। বাঁচবে কিনা ঠিক নেই। এখন তুমি বল ওই বাড়িতে কয়জন থাকে? ঢোকা কতটা সম্ভব?’

বাবুল বলল, ‘এমনিতে বেশি লোক থাকে না। এইসব কামে যা হয় স্যার। যারে দরকার তারে ডাকে। কাছের লোকজনরে।’

‘তুমি ঢুকেছ ওই বাড়িতে?’

‘জ্বে।’

আরেকটু আস্বস্ত হল অঞ্জন। বলল, ‘আচ্ছা খুব ভাল হল তাহলে। আমরা দুজন ঢুকব ওই বাড়িতে। ওদের জন্য দয়ামায়া করে লাভ নেই। গুলি করা দরকার হলে গুলি করব। যাকিছু সাক্ষিপ্রমান পাওয়া যায় বের করে পুলিশ ডাকব। পারব না?’

বাবুল সায় দিল, ‘জ্বে স্যার, আমি আছি।’

ধীরেসুসে' খাওয়া শেষ করল অঞ্জন। বাবুল একটু আগেই বাড়িতে খেয়েছে, সে চা খেল এককাপ। তারপর বসে অপেক্ষা করতে থাকল। আরো দেরী করলে ওদের কাজের সুবিধে হবে। বৃষ্টির দিন, রাত বাড়লে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে চারিদিক।

কিছুক্ষন পর অঞ্জনকে বসে থাকতে বলে বাইরে গেল বাবুল। বসে বসে দুটা সিগারেট শেষ করল অঞ্জন। প্রায় ঘন্টাখানেক পর ফিরল বাবুল।

‘চলেন স্যার।’

বাইরে বের হল ওরা। দেখল বাবুল মিশুক ঠিক করেছে একটা। ওরা উঠতে যেতেই সন্দেহের চোখে তাকাল মিশুকের ড্রাইভার। কি বুঝল সেই জানে, আপত্তি জানাল।

‘বাবুল ভাই, খারাপ কামে নিয়েন না।’

বাবুল কড়া গলায় উত্তর দিল তার, 'দ্যাখ বসিররা্যা, খারাপ কাম না, ভাল কাম। স্যার বড় গোয়েন্দা অফিসার। বুইজ্যা শুইন্যা কাম করবি। একটু এদিক ওদিক করবি তো সারাজীবন জেলে থাকবি।'

বসির আরো একবার তাকাল অঞ্জনের দিকে। অন্তত বাবুল কথার খেলাপ করে না এটা সে জানে। ওরা উঠে বসায় গাড়ি ষ্টার্ট দিল সে। বাবুল পলিথিনে মোড়া পিস্তল তুলে দিল অঞ্জনের হাতে।

'এইডা রাহেন স্যার। গুলি ভরা আছে।'

বৃষ্টির পানি থেকে বাঁচানোর জন্য পলিথিন মোড়ানো হয়েছে। সেভাবেই পকেটে রাখল অঞ্জন। বাবুলের কাছেও নিশ্চয়ই আছে একটা। ছেলেটা তৎপর। এমন একজন সাথী পেয়ে অনেক নিশ্চয়তা পাচ্ছে অঞ্জন। সে পারবে যা করতে যাচ্ছে।

ওরা যখন বাড়িটার কাছে পৌছাল তখন অধিকাংশ বাড়ির আলো নিভে গেছে। বেশ কিছুটা দুরে গাড়ি থামিয়ে নামল ওরা। বৃষ্টি বেড়েছে আবার। খুশি হল অঞ্জন। একবার ভাবল বসিরকে অপেক্ষা করতে বলে। তারপর ঝামেলা না বাড়িয়ে চলে যেতে বলল ওকে। জানিয়ে রাখল সকালের মধ্যে বাবুল না ফিরলে থানায় খবর দিতে।

হেঁটে বাড়ির দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। দেয়াল টপকে ঢোকা যাবে না, আগেই জানিয়েছে বাবুল। দাঁড়িয়ে ভালভাবে দেখল বাড়িটা। দোতলা বাড়ি। ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকলেও দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে বোঝা যায়। কেউ জেগে আছে সেখানে। বারান্দায় একটা আলো, গেটের ভেতরের যায়গাটা আলোকিত করার জন্য।

বাবুল পাশের একটা বাড়ির দেয়ালে উঠে উঁকি দিল ভেতরে। তারপরই দুরত নেমে এল অঞ্জনের কাছে।

'স্যার, ভিতরে মন্ত্রীর গাড়ি।'

'তারমানে মন্ত্রীও এখানে?'

'তাইত মনেহয়। কি করবেন?'

অঞ্জন বলল, 'থাকলেই ভাল, যা হওয়ার একটাকিছু এখানেই হয়ে যাবে। শোন, মন্ত্রী থাকা মানে আরো লোকজন আছে। অন্তত একজন-দুজন গার্ড থাকবেই। এই বাড়িরও নিশ্চয়ই গার্ড আছে। তুমি ভেতরে ঢোকার রাস্তা বের কর। মন্ত্রী বাইরে যাওয়ার আগেই যাকিছু করার করতে হবে।'

বাবুল বলল, 'স্যার আমি ওই কোনা দিয়া সাবধানে ঢুকতে পারমু। ঢুইক্যা গেট খুইল্যা দেই।'

খুব বিপদজনক কাজ সেটা। সম্ভবত অঞ্জনের ঢোকা সহজ করার জন্য বলেছে একথা। অঞ্জন বলল, 'না, লোকজন আছে ওরা জেনে যাবে। চল দেখি, তুমি ঢুকতে পারলে আমিও পারব।'

দেয়ালের ওপর দিয়ে সুচলো শিক লাগানো। সেটা দুদিকেই ফুটদেড়েক বাঁকানো। টপকাতে চেষ্টা করলে শিক গেঁথে যাবে শরীরে। দেয়ালের কোনায় দুই শিকের দুরত্ব একটু বেশি, চেষ্টা করলে হয়ত সাবধানে ফাঁক গলে যাওয়া যেতে পারে। ঝুঁকি নিতে চাইল না অঞ্জন। অন্য পথ খুঁজতে হবে।

ঘুরে বাড়িটার পাশেরদিকে গেল ওরা। অন্য একটা বাড়ির দেয়াল এসে মিশে গেছে এই দেয়ালের সাথে। এটার কথা মনে হয়নি ওদের। অনায়াসেই এই দেয়ালে উঠে কিনারা পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপর একটা লাফ দিলেই ওই বাড়ির ভেতর নামা যাবে।

দেয়ালের ওপর উঠে ভেতরটা দেখে নিল অঞ্জন। ভেতরে বাগান। এটা বাড়ির পিছন দিক। এখানে লাফ দিয়ে নামলে কেউ দেখবে না। কিছুটা শব্দ হলেও বৃষ্টির মধ্যে মাথা ঘামাবে না কেউ। বাবুলকে ওঠার ইঙ্গিত করল সে। ইশারায় লাফ দেয়ার কথা বুঝিয়ে নিজে লাফ দিল। একটু পরই বাবুল তার সঙ্গি হল।

পিস্তলটা বের করল অঞ্জন। সত্যিকারের কাজ করতে হবে এখন। বাড়িতে কোথায় কে আছে জানা নেই, কতজন আছে তাও জানা নেই। তাদের অবস্থান জানতে হবে। তাদেরকে আয়ত্বে আনতে হবে।

মুল বাড়িটার কাছে এসে চারিদিক দেখার চেষ্টা করল অঞ্জন।

বামদিক দিয়ে গেলে সামনের বাগানের কাছে যেতে পারবে ওরা। ডানদিকে বিল্ডিংটা বেড়ে গেছে প্রায় বাইরের দেয়াল পর্যন্ত। গাড়িটা থেমে আছে এরই সামনে। দুর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ড্রাইভিং সিটে বসে আছে একজন। দুজন দুদিক থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। বাবুলকে বামদিকে পাঠিয়ে নিজে ডানদিকে গেল।

যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা সহজ হল না বিষয়টা। অঞ্জন বিল্ডিংএর কোনায় এসে দেখতে পেল সামনে এগোলেই ড্রাইভার দেখতে পাবে তাকে। একেবারে তার চোখের সামনে। গাড়ি থামিয়ে সেদিকেই মুখ করে বসে রয়েছে। নিচু হয়ে বাবুলকে দেখার চেষ্টা করল। দেখল অনেকটা এগিয়ে এসেছে সে। দেখতে দেখতে গাড়ির পিছনে চলে গেল। গাড়ির আড়ালে বসে কিছু একটা করছে।

ড্রাইভারটা বোধহয় ঝিমুচ্ছিল। হঠাৎই সে টের পেল কিছু একটা ঘটছে। সোজা হয়ে বসল। পেছনের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল যাবার সময় হয়েছে কিনা। কাউকে দেখতে পেল না সে।

আবার সিটে হেলান দিল। মনেহচ্ছে কানে কিছুএকটা লাগিয়ে গান শুনছে।

একটু পরই আবার কিছু একটা টের পেল সে। দুর থেকেই অঞ্জন দেখল সামান্য নড়ে উঠল গাড়িটা। সাদা রঙের বিশাল জিপ। অন্তত কোটি টাকা দাম, অনুমান করল অঞ্জন।

ড্রাইভার দরজা খুলল। কিছু একটা নাড়াচ্ছে তার গাড়ি। দরজা খুলে নিচে পা রাখল সে। ঘুরল। এই সুযোগটাই কাজে লাগাল অঞ্জন। দুই লাফে এগিয়ে এল তার নাগালের মধ্যে। হাতের মুঠোয় পিস্তলটা উল্টো করে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল মাথায়। এতটুকু শব্দ না করে পড়ে গেল সে।

বাবুল উঁকি দিয়েছে। সে এগিয়ে এল। দুজনে ধরে টেনে নিয়ে গেল অচেতন দেহটা বিল্ডিংএর আড়ালে। দ্রুত সার্চ করল অঞ্জন। বুকের কাছে হোলষ্টারে পিস্তল। সাধারন ড্রাইভার না, একইসাথে দেহরক্ষীর কাজও করে।

এর জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। তখন যেন ঝামেলা না করে সে ব্যবস্থা করা দরকার। আপাতত নিচে আর কেউ নেই বোঝা যাচ্ছে।

বাবুল যেন বুঝতে পারল অঞ্জন কি করতে চায়। মুহূর্তে দড়ি হাজির করল সে। দুহাত পিছনে এনে ভাল করে বাঁধল দুজন মিলে। দড়ির একটা অংশ পেঁচিয়ে দিল গলার সাথে। টানাটানি করলেই গলায় ফাঁস লাগবে। কেউ খুলে না দিলে যেমন কাত করে রাখা হয়েছে সেভাবেই থাকতে হবে। মুখে গুঁজে দেয়ার মত কিছু পাওয়া গেল না। একটাই ভয়, জ্ঞান ফিরলে চিৎকার করতে পারে। সেটা করবে বলে মনে হয় না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাথায় আরেকটা ঘা লাগাল বাবুল।

প্রাথমিক কাজটুকু হয়ে গেল খুব সহজেই। এবার আসল কাজ। ভেতরে কজন আছে জানা নেই। অন্তত দুজনের বিষয়ে নিশ্চিত অঞ্জন, মন্ত্রী নিজে এসেছে এই গাড়ি নিয়ে, আর তার ডানহাত, সেই ফ্যাঁসফেসে গলার লোকটা রয়েছে। কোনভাবে টেনে বের করতে হবে ওদের।

এরই মধ্যে বাবুল জানাল গাড়িটা অকেজো হয়ে গেছে। অন্তত এই গাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না কেউ।

নিশ্চিন্ত হল অঞ্জন। একেবারে চুড়ান্ত মোকাবেলার প্রস'তি।

বাড়িটার দিকে তাকাল অঞ্জন। পুরনো ধরনের বাড়ি। মুল গেটের সোজা নিচতলায় বসার ঘর। দরজা পুরোটাই খোলা। এখান থেকেই সিঁড়ি দেখা যায় দোতলার। বসার ঘর ছাড়া নিচতলার কোন ঘরে আলো নেই। তারমানে লোকজন যা আছে সব দোতলায়।

গাড়িটা যেখানে থেমে আছে তার ওপর ঢালু ছাদ। নক্সাকরা। এটা দিয়ে দোতলার বারান্দায় যাওয়া যাবে সহজেই। এল সেপের বাড়িটার দুই প্রান্ত বাদ দিয়ে বাকিটায় বারান্দা। একবার বারান্দায় উঠলে যে কোন যায়গায় যাওয়া যাবে। সেটাই করার প্রস'তি নিল অঞ্জন। বাবুলকে বলল নিচে থেকে নজর রাখতে।

পিস্তলটা পিছনে বেল্টে গুঁজে লাফ দিয়ে লোহার ফ্রেমটা ধরল অঞ্জন। হাতে ভর করে উঠিয়ে ফেলল শরীর। পা পিছলাতে পারে। সাবধানে দেয়ালের কাছে পৌছাল সে। একটু একটু করে দেয়াল ধরে এগোতে লাগল বারান্দার দিকে। ওর দিকে এবং একই সাথে নিচতলার দরজার দিকে চোখ রাখতে বাগানের দিকে সরে গেছে বাবুল। একেবারে খোলা যায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে।

হঠাৎই একজন লোক বের হল নিচতলা থেকে। দেয়াল ঘেঁসে একেবারে জমে গেল অঞ্জন। একটু নড়াচড়া করলেই চোখে পরবে সে।

লোকটা গাড়ির দিকে চেয়ে আছে। ড্রাইভারকে দেখার চেষ্টা করছে। তখনই বাবুলকে দেখতে পেল লোকটা। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপরই চিনতে পারল এ ওদের লোক না। পিস্তল বের করল সে।

গুলি করল বাবুল। কোথায় লাগল বোঝা গেল না, পরে গেল লোকটা। সেই অবস্থাতেই গুলি করল বাবুলকে।

দ্রুত বাকি যায়গাটুকু পার হল অঞ্জন। রেলিং ধরে ফেলল। একলাফে উঠে পরল বারান্দায়।

মাটিতে পড়ে গেছে বাবুল। শুয়ে আছে। সেই অবস্থায় আবার গুলি করল লোকটাকে। মুহূর্তে নড়াচড়া থেমে গেল লোকটার। অঞ্জন দেখল দোতলার একটা দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে বের হল একজন। তারও হাতে পিস্তল।

পিছন থেকে আলো পরেছে বলে মুখ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে মাথায় সামনের দিকে টাক। সোনালী নক্সাকরা সাদা কোট পড়নে। ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে কেউকেটা একজন।

পাতিমন্ত্রী।

তার পিছনে মোটাসোটা আরেকজন উঁকি মারল।

বারান্দায় বের হয়েই সোজা বাবুলতে শুয়ে থাকতে দেখল মন্ত্রী। পিস্তল উঠাল। দুহাতে পিস্তল ধরেছে। তাক করছে। গুলি করল অঞ্জন। চিৎ হয়ে পরে বারান্দার ছাদে গুলি করল লোকটা। তারপরই দুহাত ছড়িয়ে গেল দুদিকে।

পিছনের মোটা লোকটা দেখতে পেয়েছে বাবুলকে। এবার অঞ্জনকেও দেখল। মুহূর্তে ঘুরে দৌড় দিল ঘরের দিকে। আরেকটা গুলি করল অঞ্জন। লাগল কি লাগল না বোঝা গেল না, সেই অবস্থায়ই দৌড়ে ভেতরে গেল লোকটা।

বাবুলের দিকে তাকিয়ে দেখল অঞ্জন। ওঠার চেষ্টা করছে। পা টলছে। গুলি লেগেছে কোথাও। কোনমতে উঠে দাঁড়াল। হাতে পিস্তল ধরে তাকিয়ে আছে অঞ্জনের দিকে। বুঝিয়ে দিচ্ছে সে ঠিক আছে।

আস্তে হেঁটে খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। মোটা লোকটা আছে ভেতরে। থাকতে পারে আরো লোকজন। যে কোন দিক থেকে গুলি ছুটে আসতে পারে যে কোন সময়।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটা একবার দেখল অঞ্জন। পালিশ করা চেহারা। ছোট করে ছাটা গোফ, বেকহ্যাম ষ্টাইল চুল। কয়েক মুহূর্ত আগেও নিজেকে এমন একজন ভাবত যে ইচ্ছে করলে যা খুশী করতে পারে। এখানে এসেছিল হয়তো তেমনই কিছু করার পরিকল্পনা করতে। এখন সে সবধরনের হিসেব নিকেশের বাইরে।

কোন সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না ভেতর থেকে। মনেহচ্ছে মোটা লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই। থাকলে বের হত। মোটা লোকটা লুকিয়েছে কোথাও। ঘাপটি মেরে আছে আড়ালে। বাইরে যাবে না, বাবুল রয়েছে সেটা জানে সে।

ঘরে ঢুকল অঞ্জন। কয়েক ফোঁটা রক্ত পরেছে। লোকটার শরীর থেকে বেরিয়েছে। সে যদি একাই থাকে তাহলে তাকে এই দাগ দেখে খুঁজে বের করতে পারবে সে। আরেকবার বাইরে তাকাল অঞ্জন। বাবুল নিচতলার দিকে এগোচ্ছে। এগিয়ে এসেছে অনেকটা। নিচতলায় ঢুকছে।

সাবধানে ভেতরে ঢুকল সে। গুলি করার জন্য পিস্তল তৈরী। মাত্র দুটা গুলি করেছে সে, আরো অন্তত চারটা থাকার কথা। ঘরের আরেক দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে এসে পরল সে। রক্তের দাগ ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুদুর গিয়ে আরেক ঘরে ঢুকেছে। তারমানে ওই ঘরে আছে লোকটা। ঘরের দরজা খোলা।

সাবধানে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অঞ্জন। গুলির শব্দ শুনল নিচ থেকে। পরপর দুবার। বাবুলের সামনে পরেছে কেউ। অথবা বাবুল কারো সামনে পরেছে। কে কাকে গুলি করল কে জানে?

ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক হল অঞ্জন। অনেক বড় ঘর। নিচ থেকে এই ঘরেই আলো দেখেছে সে। একদিকে বড় বিছানা পাতা। একপাশে বড় টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। মেঝেয় সুন্দর নক্সা করা কার্পেট। কার্পেট টেনে একদিকে সরানো। একটা কাঠের চৌকো ঢাকনা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। গোপন দরজা। ভয় পেয়েছে লোকটা। তাকে যে রক্ষা করার সে যখন নেই তখন পালানোই সবচেয়ে ভাল মনে করেছে সে। ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

ঘরটা দোতলায়, গোপন পথ দিয়ে বাইরে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব না। নিজেকেই বুঝাল অঞ্জন, এটা খুব বেশী হলে গোপন কোন ঘর। সম্ভবত নিচতলায়। হয়ত নিচতলায় ঘরে ঢোকার কোন দরজা নেই, হয়ত বোঝাও যায় না সেখানে কোন ঘর আছে। এটাই একমাত্র পথ ঘরে ঢোকার। কার্পেট না সরিয়ে কেউ বাড়ি সার্চ করলে সহজে সেই ঘরের খোঁজ পাবে না।

চারিদিকে একবার তাকাল অঞ্জন। এখানে বসেই আলাপ করছিল ওরা। ঘরে এখনো সিগারেটের গন্ধ। এ্যাসট্রে, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার টেবিলে রাখা।

পিস্তলটা নামাল অঞ্জন। এই ঘরে কেউ থাকে। সম্ভবত মোটা লোকটা। তার জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে। একটা রাতের পোষাক রাখা আছে চেয়ারে। সেটাই বেছে নিল সে।

চৌকো কাঠটা টেনে দেখল সরানো যাবে। এরই নিচে বসে আছে লোকটা। নিশ্চয়ই অস্ত্র রয়েছে সাথে।

লাইটারটা এনে আগুন ধরাল কাপড়ে। ভালভাবে ধরার সুযোগ দিল। ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘর। কাঠটা টেনে সামান্য ফাঁক করে নিচে ফেলে দিল সে জ্বলন্ত কাপড়টা। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিল। যদি বের হওয়ার অন্য পথ না থাকে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে, নয়ত বের হতে হবে। পিস্তল হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল অঞ্জন।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

অন্য কোন দরজা দিয়ে কি পালাল?

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সে। দরজায় দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দেখা যায়। বাবুল টলতে টলতে উঠে আসছে সিঁড়ির রেলিং ধরে। অঞ্জনকে দেখে থামল। হাঁসল।

তক্ষুনি শব্দ শুনল অঞ্জন। কাঠের পাটাতনের নিচ থেকে। কেউ ধাক্কাচ্ছে সেটা। পিস্তল তাক করে থাকল অঞ্জন। একট ুপরই একদিকে সরে গেল কাঠটা। প্রথমেই লোকটা দুহাত উচু করে দেখাল হাত খালি। তারপরই মোটা লোকটার মাথা দেখা গেল। কাঁশছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। মাথা বের করেই দেখল অঞ্জনকে। সোজা পিস্তল ধরে আছে তার মাথার দিকে।

পিস্তল তাক করে রেখে ওকে ওঠার সুযোগ দিল অঞ্জন।

উঠেই শুয়ে পরল লোকটা। এমনিতেই অতিরিক্ত মোটা, তারসাথে মনে হয় শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। ধোঁয়ায় একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। গুলি লেগেছে বোধহয় পিঠের একপাশে।

পিস্তল ধরে রেখে ওকে সামলে ওঠার সুযোগ দিল অঞ্জন। শুয়ে থেকেই অঞ্জনের দিকে কাতরভাবে চেয়ে থাকল লোকটা। স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতেই উঠে বসার ইঙ্গিত করল অঞ্জন। লোকটা উঠে বসল। তখনই হাত দিল গুলি লাগা যায়গাটায়। এতক্ষনে যেন টের পেল তার গুলি লেগেছে। হাত সামনে এনে দেখল তাতে রক্ত। কাতরভাবে প্রানভিক্ষা করল সে।

'মাইরেন না ছার, আমার কোন দোষ নাই।'

সেই ফ্যাঁসফেসে গলায়।

পিস্তলটা হাতে ধরে রেখে দরজার দিকে এগোল অঞ্জন। দরজায় দাঁড়িয়ে বাবুলের দিকে তাকাল। আরো এগিয়ে এসেছে সে। বোঝা যাচ্ছে আর কেউ নেই বাড়িতে। কাছে এসে দাঁড়াল বাবুল। ওর ক্ষতটা দেখল অঞ্জন। কাঁধের একটা অংশ ছিড়ে গেছে গুলিতে। ওকে বসতে বলে পরিস্কার একটুকরো কাপড় খুঁজে বের করল সে। চেপে ধরল ক্ষতটার ওপর। রক্তপাতই সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন। সেভাবেই চেপে ধরে রাখতে বলল ওকে।

মোটা লোকটা নড়ছে না এতটুকু। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। তার সব আশা শেষ হয়ে গেছে। বাবুলকে দেয়াল ঘেঁসে বসে থাকতে বলল অঞ্জন। এখনো শক্তি হারায়নি বাবুল।

'ওর দিকে পিস্তল ধরে রাখ। নড়াচড়া করলে গুলি করবে।' মোটা লোকটাতে শুনিয়ে বাবুলকে নির্দেশ দিল অঞ্জন।

মোটা লোকটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে সে কোনরকম ঝুঁকি নেবে না।

চৌকো গর্তটার কাছে এসে উঁকি দিল অঞ্জন। নিচে অন্ধকার। সুইচবোর্ডের সবগুলি সুইচ অন করার পরও আলো জ্বলল না। একপাশে মোমবাতি দেখে সেটাই জ্বালিয়ে নিচের যায়গাটা দেখার সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নিচের দিকে। দশফুট, আন্দাজ করল অঞ্জন। এটাই একতলার স্বাভাবিক হাইট। নামার প্রস'তি নিল সে। বাবুলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে একহাতে মোমবাতি আরেকহাতে পিস্তল ধরে সাবধানে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। নেমে নিচের মেঝেতে দাঁড়াল। তার ফেলা কাপড়টা নিভে গেছে অনেক আগে। ধোঁয়াও কমে গেছে অনেকটা। মোমের আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে সবকিছু। বেশ বড় ঘরটা। কালচে রঙের দেয়াল। মোমবাতিটা আরেকটু উচু করল অঞ্জন। তখনই দেখল সোজা সামনের দিকে দেয়াল ঘেসে কংকালের মুখোসপরা একজন লোক দাঁড়িয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পিস্তল থেকে গুলি ছুটে গেল।

দরজার কাছের লোকদুজন লুটিয়ে পরল গুলি খেয়ে। আরেকজন পিস্তল ঘুরাচ্ছে, গুলি করবে। লোকটা আর তার মাঝে একটা পিলার। লাফ দিল সে। শুন্যে থাকতেই গুলি করল। নিচু শোকেসের সাথে পা ঠেকল তার। আরেকজন আছে এদিকে। পা দিয়ে শোকেসে ধাক্কা মারল সে। আবারও শুন্যে ভেসে উঠল শরীর। শুন্যেই শরীর ঘুরিয়ে গুলি করল। তখনই কিসের সাথে ঠুকে গেল মাথাটা। সব অন্ধকার হয়ে গেল অঞ্জনের কাছে।

না অঞ্জন না, তুষারের কাছে। হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফেরে তখন কিছুই মনে করতে পারছিল না তুষার। নিজের নামও না। তখনই অঞ্জন নামটা শুনতে পায় সে। ওর নাম অঞ্জন না, তুষার। পুরোনাম ইফতেখার আহমেদ। ইস্কাটন রোডে ওর খালার বাড়ি। সেখানেই ও বড় হয়েছে। ও যখন একেবারে ছোট তখন একটা গাড়ি একসিডেন্ট করে। জানালা দিয়ে ও ছিটকে চলে যায় বাইরে। ওর বাবা-মা গাড়ির ভেতরে ছিলেন। ওর মনে নেই তাদের কথা। খালা কখনো মনে করতে দেননি। মায়ের চেয়ে বেশী আদর দিয়ে মানুষ করেছেন তাকে।

ও ফিরেছে তাকে কোন খবর না দিয়ে। তাকে চমকে দেবে বলে। হঠাৎ করে হাজির হবে তার সামনে। রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে সেন্ট কিনতে ঢুকল দোকানে। জেসমিন। খালার খুব প্রিয়।

ছোট্ট একটা মেয়ে তার কাপড় ধরে টানল। বলল তার নাম জেসমিন। তারপরই কংকাল আঁকা মুখোস পরা কয়েকজন লোক। তাদের হাতে পিস্তল।

সব মনে পরেছে ওর।

পিস্তলটা নিচু করল তুষার। মানুষ না ওটা। একটা মুখোস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালের সাথে। মোমবাতির আলোয় ওটাকেই দাঁড়ানো মানুষ মনে করেছিল সে। এমন বন্ধ ঘরে মানুষ থাকতে পারে না। পিস্তলটা বেল্টের ফাঁকে গুঁজে রেখে দিল সে। এখন ওটা দরকার হবে না।

সামনের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল তুষার। কালো কিংবা বাদামী রঙের দেয়াল। সারা গায়ে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল ঝুলানো। যেন অস্ত্রের প্রদর্শনী, মিউজিয়ামে সাজিয়ে রেখেছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আরো অনেকগুলো। এত অস্ত্র কোথায় ব্যবহার করে? খুব শক্তিশালী অস্ত্র মনে হচ্ছে। এসল্ট রাইফেল, বলেছিলেন এখলাস সাহেব। মনেহয় এগুলোই।

নিচে কয়েকটা কাঠের বাক্স। নিচু হয়ে ভাল করে দেখল তুষার। তালা দিয়ে আটকানো লম্বাটে বাক্স। দেখে কফিন মনে হয়। ধাক্কা মেরে দেখল এতই ভারী যে একা সরানো যাবে না। সরানো দরকারও নেই। হয়ত রাইফেল, হয়ত গ্রেনেড কিংবা আরো বড় কিছু।

এত অস্ত্র- নিয়ে ধরা পরলে সারাদেশে হৈচৈ পরে যাবে। কোনমতেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে না।

ঘুরে ওপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল তুষার।

বাবুল বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। হাতে পিস্তল তাক করা। পিস্তলের মুখটা তার দিকে। চোখে সাবধানী দৃষ্টি। নিচ থেকে গুলির শব্দ শুনেছে সে। তুষারকে দেখে জোর করে হাঁসল যেন। ওর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে মনে হচ্ছে। তার সাধ্যমত সে কাজ করে যাচ্ছে।

ওর কাছে এসে বসল তুষার। আরেকবার দেখল ওর ক্ষত। রক্ত বের হচ্ছে না, কিন' এই অবস্থায় বেশিক্ষন থাকতেও পারবে না সে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। বলল, 'শোন বাবুল, আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি এই অবস্থায় যেতে পারবে না। এক্ষুনি পুলিশ আসবে, ওরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। পুলিশ দেখে ভয় পেয় না। ওরা তোমাকে কিছু বলবে না। ঠিক আছে?'

কোনমতে মাথা নেড়ে সায় দিল বাবুল।

উঠে দাঁড়াল তুষার। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরল। মোটা লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। এ লোক ধুর্ত। এভাবে আহত বাবুলের ওপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। ও জ্ঞান হারাতে পারে। এই লোকটা সে সুযোগ কাজে লাগাবে।

ঘুরে এসে লোকটার হাত-পা ভাল করে বাঁধল সে। কেউ খুলে না দিলে একা কোনমতেই খুলতে পারবে না। তাকে উল্টোদিকে এমনভাবে মুখ করে রাখল যেন বাবুলের দিকে দেখার সুযোগ না পায়। ওকে শুনিয়ে আরেকবার সাবধান করল বাবুলকে।

'দরকার হলে গুলি করবে, তবে মেরে ফেল না। ওর কথা বলা দরকার।'

বাবুল মাথা নেড়ে বুঝাল সে বুঝেছে।

গেট খুলে রাস্তায় এসে তুষার দেখল বৃষ্টি বেশ কমে এসেছে। তুষারকে দেখে অন্ধকার থেকে বসির এগিয়ে এল। অবাক হল তুষার, ও যায়নি এখনো। কিংবা গেলেও ফিরে এসেছে।

তুষার বলল, 'চলো। বাবুল ভেতরে আছে, এখানে থাকবে কিছুক্ষন।'

বসির বলল, 'এইহানে খারান সার, গাড়ি আনি।'

সে চলে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

সেখানেই রাস্তায় দাঁড়াল তুষার। আশেপাশের কোন বাড়িতেই এখন আলো দেখা যাচ্ছে না। জোরে বৃষ্টি না থাকলেও বাতাস বইছে। লোকজন ঘরের জানালা এঁটে দিয়েছে। সামনে পা বাড়াতেই কোমড়ের কাছে পিস্তলটা হাতে ঠেকল তুষারের। এটার কোন প্রয়োজন নেই আর। পিস্তলটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল দেয়ালের ওপর দিয়ে। পুলিশ চারিদিকে খুঁজলে ওটাও পাবে।

অন্ধকার থেকে মিশুকটা ঠেলে রাস্তায় আনল বসির। তুষার উঠে বসতেই ষ্টার্ট দিয়ে রওনা হল মোড়ের দিকে।

রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। মোড়ে গিয়ে একটা খোলা দোকান দেখতে পেল তুষার। এখান থেকেই ফোন করেছিল ফ্যাঁসফেসে গলার লোকটার কাছে। সেই ছেলেটাই বসে আছে এখনো।

দোকানের সামনে নেমে বসিরকে চলে যেতে বলল সে, 'বাবুলের বাড়িতে বলবে ওর ফিরতে দেরী হবে। ওর জন্য চিন্তা না করে।'

বসির চলে যেতে সে ঢুকল দোকানে। তাকে দেখেই হেঁসে সামনের দিকে ফোন এগিয়ে দিল ছেলেটা।

এখলাস সাহেবের ফোন উঠাল একজন পুরুষ মানুষ। সরাসরি কাজের কথায় গেল তুষার, 'আমি এখলাস সাহেবের সাথে কথা বলব। খুব জরুরী। আমার নাম অঞ্জন।'

এখলাস সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সময় নিলেন না ফোন ধরতে।

'হ্যাঁলো, আমি অঞ্জন। আপনাকে এক্ষুনি কিছু কাজ করতে হবে। গুলশান ৭ নম্বর রোড ২১ নম্বর বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। ওটা এই দলের ঘাঁটি। ওখানে অনেক অস্ত্র পাবেন একটা লুকানো ঘরে। কয়েকজন লোককেও পাবেন। বাবুল নামে একটা ছেলে ওদের পাহারা দিচ্ছে। ছেলেটা ওদের দলের কেউ না। ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া দরকার। দেরী করা যাবে না। ৭ নম্বর রোড, ২১ নম্বর বাড়ি।'

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা রেখে দিল তুষার।

অঞ্জনের কাজ শেষ।

বৃষ্টির জোর আবার বেড়েছে। বড়বড় ফোঁটা পড়ছে একটানা। পড়-ক। রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। গাড়ি পাওয়া যাবে না মনে হয়। না যাক। হেঁটেই চলে যাব। কতই বা সময় লাগবে? একঘন্টা, বড়জোর দেড়ঘন্টা। দেড়ঘন্টায় পৌছে যাব আমার ঠিকানায়। আমার সেই পরিচিত গলি। সেই পরিচিত দরজা। বাইরে থেকেই হাত ঢুকিয়ে গেট খুলে ফেলতে পারব। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও কোন ঠোক্কর না খেয়ে ঘরে ঢুকতে পারব। সোজা উপস্থিত হব খালার সামনে। তাকে একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে।

যদি লোডসেডিং থাকে? সত্যিই চমকে দেয়া যায় খালাকে। কাঁপাকাঁপা মোমবাতির আলোয় আমাকে দেখে চমকে উঠবেন। বলবেন, 'আরে তুষার, কিভাবে এলি?'

পরিস্কার যেন শুনতে পেলাম তার কণ্ঠ।

খালাকে আরো চমকে দিলে কেমন হয়? যদি রেবেকাকে সাথে নিয়ে যাই? একেবারে হতবাক হয়ে যাবেন তিনি। তারপর কোনমতে সামলে নিয়ে বলবেন, 'তুষার, তুই পারলি এমন কাজ করতে? আমাকে না জানিয়ে? কি ছেলে রে তুই!'

রেবেকা কি যাবে আমার সাথে?

(শেষ)